৭.০৭ ভৌতিক গহ্বরে মৃত্যুদূত – Bangla Library

৭.০৭ ভৌতিক গহ্বরে মৃত্যুদূত – Bangla Library

ভৌতিক গহ্বরে মৃত্যুদূত–১০৭

দুখানা সাঁড়াশির মত হাত চেপে ধরলো বনহুরের গলা। সেকি ভীষণ ঠাণ্ডা হাত দুখানা। বনহুর আর্তচিৎকার করে উঠলো।

ঠাণ্ডা হাত দুখানা বনহুরকে টেনে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। কোন অতল গহ্বরে বনহুর তলিয়ে যাচ্ছে।

চোখ দুটো টিকরে বেরিয়ে আসছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো বনহুর।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই সংজ্ঞা ফিরে এলো বনহুরের। চোখ মেলে তাকাতেই দেখলো সে আধো অন্ধকারে কোনো শক্ত বস্তুর উপর চীভাবে পড়ে আছে। পিঠে, কাঁধে এবং গলায় ভয়ানক ব্যথা অনুভব করলো।

কিন্তু এখন সে কোথায় তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। সে কিছু ভাবতে পারছে না যেন।

তবু বনহুর উঠে বসলো এবং পিঠের তলা থেকে একমুঠো শক্ত বস্তু তুলে নিলো হাতে। চোখের সামনে আনতেই বিস্ময়ে হতবাক হলো, শক্ত বস্তুগুলো আধো অন্ধকারে চক্‌চক্‌ করে উঠলো।

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো–মোহর।

এত মোহর কল্পনার অতীত যেন।

বনহুর এবার তাকালো চারপাশে। শক্ত হাত দুখানার কথা মনে পড়লো। কি ভীষণ ঠাণ্ডা দুখানা হাত। বনহুর বাম হাতখানা তুলে নিজের গলা এবং ঘাড়টা একবার নেড়ে নিলো।

সব ব্যথা ভুলে গেলো বনহুর মোহরের দিকে তাকিয়ে। মোহরগুলো নিয়ে সে কিছুদিন চালিয়ে নিতে পারবে কয়েক কোটি মানুষকে হঠাৎ তার চিন্তাধারায় বাধা পড়ে। একটা গরম বাতাস তার দেহে এসে লাগছে। গরম বাতাসটা কোন্‌ পথে আসছে আর কোথা হতেই বা আসছে।

ভৌতিক গহ্বরে মৃত্যুদূত কেউ আছে, যার বাহু কঠিন শক্ত আর বরফের মত ঠাণ্ডা। তবে কি এ তারই নিঃশ্বাস

বনহুর ফিরে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে জমে গেলো যেন তার শরীরের রক্ত। একটা বিরাট গর্তের মধ্য হতে সেই গরম হাওয়া আসছে। একি, দুটো আগুনের বল জ্বলছে। বনহুর চমকে উঠলো, নিশ্চয়ই কোনো জীবের দুটো চোখ। কিন্তু জীবটা কি?

এমন ভয়ংকর অবস্থায় বনহুর আরও বহুবার পড়েছে কিন্তু এমন পরিস্থিতি ঘটেনি।

বনহুরের বুকের ভিতরটা যেন হিমশীতল হয়ে উঠলো। আগুনের বল্ দুটো কোনো জীবের চোখ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবটা কি এবং কত ভয়ংকর কে জানে?

সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর।

তার প্যান্টের পকেটেই ছিলো রিভলভার সে উদ্যত করে ধরলো রিভলভারখানা।

বনহুর বুঝতে পারলো যে চোখ দুটো আগুনের বলের মত লাগছে সে চোখ এই রিভলভারের গুলীতে নিভে যাবে না।

বনহুর এবার কিছুটা এগুলো গর্তটার দিকে। সো সো করে গরম হাওয়া আসছে, বনহুরের গা জ্বালা করে উঠলো, যেন আগুনের হলকা। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর গুলী ছুড়লো সেই আগুনের বল দুটি লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কানফাটা শব্দ বেরিয়ে এলো। বনহুর দুহাতে কান দুটো ঢেকে ফেলল, সে কি ভীষণ আওয়াজ!

বনহুর পুনরায় গুলী ছুঁড়লো।

এক দুই তিন পরপর কয়েকটা।

তীব্র আর্তনাদ।

যেন কোনো এক ভয়ংকর মেশিনের আওয়াজ।

আলো দুটো বেরিয়ে আসছে।

বনহুর দেখলো অদ্ভুত এক জন্তু। কতকটা জলহস্তী ধরনের, কিন্তু জলহস্তী নয়। সামনের দিকে দুটো শুড় আছে। বনহুর বুঝলো ঐ দুটো শুড় দিয়েই জন্তুটা তাকে আক্রমণ করেছিলো।

জন্তুটা গড়িয়ে গড়িয়ে এগুচ্ছে।

এবার ওর নিঃশ্বাসের শব্দটা ফোঁস ফোঁস করে একটা বিশ্রি আওয়াজ তুলছে।

বনহুর পুনরায় গুলী ছুঁড়লো।

অমনি জন্তুটা কাৎ হয়ে পড়ে গেলো।

এবার ফোঁস ফোঁস শব্দটা ধীরে ধীরে নীরব হয়ে এলো। আগুনের বল দুটো নিভে গেলো যেন তার সঙ্গে সঙ্গে।

বনহুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

এখন বনহুর আর মুহূর্ত অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেলো বিস্ময়কর জীবটার দিকে। জীবটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। একটা অজানা জীব, এই জীবটাই ছিলো ভৌতিক গহ্বরের মৃত্যুদূত।

বনহুর অদ্ভুত জীবটার দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর দ্রুত পকেট থেকে রুমালখানা বের করে বেশ কিছু মোহর বেঁধে নিলো। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে, যাক কিছু দুঃস্থ মানুষকে বাঁচাতে পারবে সে।

এবার বনহুর বেরিয়ে এলো সেই ভৌতিক গহ্বর থেকে।

চারপাশে আলোর বন্যা।

সূর্যের আলোতে বনহুর নতুন করে জীবন লাভ করলো।

পদশব্দে ফিরে তাকালো আশা।

কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে না কিছু।

তবে কি জাভেদ এসেছে?

আশা বললো–কে?

বনহুর কাঁধে হাত রাখলো আশার, বললো–আমি।

তুমি! তুমি এসেছো?

হাঁ আশা, আমি এসেছি। এবার আমি তোমাকে নিয়ে যাবো সেই সুদূর লণ্ডনে। তোমার চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবো কিন্তু...

বলো, থামলে কেন বনহুর?

তার পূর্বে আমার কিছু কাজ আছে।

কি কাজ?

ফাংহা দ্বীপে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, তার সঙ্গে দেখা দিয়েছে মহামারী। আশা, আমি তোমার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছিলাম তোমার ভূগর্ভ আস্তানায়, তারপর ভৌতিক গহ্বরে

বনহুর! ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললো আশা।

বনহুর বুঝতে পারলো আশা ভৌতিক গহ্বরের নাম শুনে শিউরে উঠেছে। একবার নয়, কয়েকবার আশা ভৌতিক গহ্বরে জাভেদের প্রবেশ ব্যাপার নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছিলো। বনহুর নিজেও ঐ গহ্বরে প্রবেশ করে মৃত্যুমুখে পতিত হবার উপক্রম হয়েছিলো, কাজেই আশার আশঙ্কিত হবার কারণ যথেষ্ট রয়েছে।

বনহুর একটু হেসে বললো–আশা, ভৌতিক গহ্বরের রহস্য উদঘটিত হয়েছে এবং ভৌতিক গহ্বরের ভয়ংকর রহস্যের যবনিকা পাত ঘটেছে।

বনহুর, এ তুমি কি বলছো।

হা সত্যি।

তা কি আমাকে বলবে?

সে এক অদ্ভুত কাহিনী।

আমাকে বলল আমি শুনতে চাই।

বনহুর সমস্ত ঘটনা বলে গেলো আশার কাছে।

অদ্ভুত জীবটাকে বনহুর হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে। আর কোনো ভয় নেই ঐ গহ্বরে এবং সেখানে রয়েছে বহু মোহর যে মোহর দিয়ে শুধু কান্দাইবাসী নয়, পৃথিবীর বেশ কিছু মানুষের উপকার করা সম্ভব হবে।

বললো বনহুর–আশা, যে মোহর আমি এই রুমালে বেঁধে এনেছি তা দিয়ে বেশ কিছুদিন ফাংহা দ্বীপবাসীদের উপকার করা মানে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।

আমি খুশি হলাম, কিন্তু তুমি আমাকে না জানিয়ে ঐ ভয়ংকর গহ্বরে কেন প্রবেশ করেছিলে? খোদা না করুন, কিছু একটা যদি ঘটে যেতো তাহলে কোনদিন জানতেও পারতাম না বা কেউ জানতো না তুমি কোথায় হারিয়ে গেছো...

আশা, তুমি তো জানো আমি মৃত্যুকে ভয় করি না আর ভয় করি না বলেই বহুবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে গেছি কিন্তু মৃত্যু আমাকে আলিঙ্গন করতে সাহসী হয়নি। কাজেই আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম এ ব্যাপারে। আশা, এই মোহরগুলো ওকে দিয়ে আবার ফিরে আসবো।

আশ্চর্য কণ্ঠে বললো আশা–ওকে মানে? তুমি কার কথা বলছো?

মিস সোমার কথা বলছি। সে চায় দেশ ও দশের জন্য কাজ করতে, তাদের সেবা করতে। আশা, আমি মিস সোমাকে কথা দিয়েছি

মিস সোমা, কে সে?

তোমাকে বললাম তার পরিচয়, এর বেশি জানি না। মেয়েটাকে আমি যদি ঠিক মুহূর্তে নদীবক্ষ থেকে তুলে আনতে সক্ষম না হতাম তাহলে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত ছিলো।

আশা বললো–তুমি তাকে রক্ষা করে খুব ভালো কাজ করেছো। যাও বনহুর, ঐ মোহর তুমি তাকে দিয়ে এসো এবং ফাংহাদ্বীপবাসী, না খেয়ে যেন না মরে, সেদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে বলো।

হাঁ, মিস সোমা তাই চায়। সে ঐ দ্বীপে গিয়ে দুঃস্থ দ্বীপবাসীর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবে।

তাহলে আর বিলম্ব করো না, যাও বনহুর।

বনহুর মোহরের পুটলিটা আশার হাতে দিয়ে বলল—-এগুলো তো তোমার জিনিস। তুমি তুলে দাও আশা।

আশা একটু হেসে বললো–বনহুর, আমার জিনিস যা কিছু সব তত তোমার, তুমি যত খুশি নিয়ে যা খুশি করতে পারো।

আশা এবার তাহলে চলি।

আশা মোহরের পুটলিটা এবার বনহুরের হাতে দিয়ে বললো–যাও।

বনহুর বেরিয়ে গেলো। আশা শুনতে পেলো তাজের খুরের শব্দ।

একটা দীপ্ত আনন্দপূর্ণ ভাব ফুটে উঠলো আশার চোখেমুখে। তার দুচোখ অন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু মনের দৃষ্টি তো নষ্ট হয়নি। তাই তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো পূর্বের একটার পর একটা ছবি। বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে বসে উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। আশা অপর এক অশ্বে আরোহণ করে তাকে ফলো করছে। আনন্দে দীপ্ত আশার চোখমুখ, হৃদয় চায় ওর সঙ্গে মিলন। ওকে পাবে না আশা কোনোদিন হয়তো, তবুও ওকে সে ভালবাসে। আবার অপর এক দৃশ্য প্রতিফলিত হয় আশার মনের পর্দায়, বনহুর গভীর জঙ্গলে এগিয়ে চলেছে, হাতে তার রিভলভার। আশা তার পেছনে পেছনে এগিয়ে যাচ্ছে আড়ালে আত্মগোপন করে, নজর তার বনহুরের দিকে। কোনো বিপদ যেন ওকে স্পর্শ করতে না পারে। হঠাৎ একদিন আচম্বিতে ঢলে পড়ে বনহুর। তাকে সর্পদংশন করেছে। জানতে পারে আশা, তারপর চলে যমে আর আশাতে লড়াই। আশা জয়ী হয় বনহুর জীবন লাভ করে। আজ নতুন করে এই পুরানো স্মৃতিগুলো আশার মনের আকাশে একটার পর একটা প্রতিফলিত হতে লাগলো।

ততক্ষণে বনহুরের অশ্ব পদশব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে।

আশা ফিরে দাঁড়াতেই তার কানে ভেসে আসে মনিয়ার কন্ঠস্বর–দুধ!

দুধ এনেছে মনিয়া?

হাঁ মা জী। দুধ জ্বাল করে দেবো?

দাও! বললো আশা।

এমনি করে মনিয়া রোজ কখনও ফলমূল কখনও দুধ, কখনও ভাত নিয়ে আসে আশার জন্য। আশাকে মনিয়া মায়ের মত ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। আশাও মনিয়াকে সন্তানের চেয়ে কোনো অংশে কম মনে করে না, সে তাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করে।

আগের দিনে মনিয়ার বাবাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হতো এখন আর তাকে তেমন পরিশ্রম করতে হয় না। বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বরের আরাধনা এবং যৎসামান্য গৃহকর্ম করে দিন কাটে তার।

মনিয়ার গরু আছে অনেকগুলো।

সেই গরু নিয়ে কাটায় মনিয়া। বনে বনে কাঠ কাটে, গরুর দুধ দুয়ে গ্রামাঞ্চলে বিক্রি করে। নিজের ইচ্ছামত প্রচুর দুধ পান করে। এমনি করে দিন কাটে মনিয়াদের। বলতে গেলে এখনও তাদের কোনো অভাব অভিযোগ নেই। আশার সাহায্যে আজ তারা সুখে দিন যাপন করছে।

মনিয়া সময়মত এসে সবকিছু করে দিয়ে যায় আশার। আশার স্নান করা থেকে খাবার পরিবেশন সব মনিয়া নিজে করে।

মাঝে মাঝে আশার চোখ বেয়ে দিয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি। কারণ মনিয়া তার কেউ নয় তবু সে তার জন্য কত করে।

আশার মনে পড়ে অনেক কথা।

মনিয়া দুধ জ্বাল করে গেলাস ভরে নিয়ে আসে–দুধ খেয়ে নে মাজী।

আশার দুঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললো–দে মনিয়া! তারপর দুধের গেলাসটা তুলে নিলো মুখে।

দুধ পান করে খালি গেলাসটা মনিয়ার হাতে ফেরত দিয়ে বললো মনিয়া তোক কি বলে যে আশীর্বাদ করবো ভেবে পাই না। তুই যেন আমার পেটের সন্তানের মত।

মনিয়া নীরবে একটু হাসলো।

আশা বললো–এবার যা মনিয়া, আমি ভালই আছি।

মনিয়া খালি গেলাসটা ঘরে রেখে চলে গেলো।

আশা বসে পড়লো কুঠিরের বারান্দায়।

*

মিস সোমা বাগানে পায়চারী করছিলো।

এমন সময় একখানা গাড়ি এসে থামলো বাগানটার সামনে।

সোমা তাকালো, দেখলো ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এলো এবং সে মালির সঙ্গে কিছু আলাপ করছে।

মিস সোমা বুঝতে পারলো ড্রাইভার কিছু বলছে।

সে উৎসুক মন নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

একটু পর মালি এসে বললো–আপামণি, একজন ড্রাইভার এই চিঠি এবং এই পুটলিটা দিয়ে বললো, তোমার আপামণিকে দাও।

একটু আশ্চর্য হয়ে বললো মিস সোমা–চিঠি আর পুঁটলি। হাতে নিলো মিস সোমা চিঠি ও পুঁটলিটা। প্রথমেই আশ্চর্য হলো সোমা, কারণ পুঁটলি বা থলেটা ভীষণ ভারী ছিলো এবং মজবুত করে বাঁধা ছিলো। ওটাতে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না মোটেই।

মিস সোমা চিঠিখানা মেলে পড়তে শুরু করলো, ঐ সময় গাড়িখানা চলে যাবার শব্দ কানে ভেসে এলো তার। চিঠি থেকে দৃষ্টি তুলে একবার তাকালো সে গাড়িখানার দিকে। তারপর চিঠিখানা পড়তে লাগলো–

প্রিয় সোমা, তুমি বলেছিলে আমাকে সর্বকাজে সহায়তা করবে, তাই তোমাকে কিছু মোহর দিয়ে গেলাম। তুমি ফাংহা দ্বীপে যাবে এবং ফাংহার দুঃস্থ মানুষের

মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র এবং ওষুধ দেবে। তারা যেন চরম দুর্দশা থেকে মুক্তি পায়। তোমার—- অজানা বন্ধু।

চিঠিখানা পড়া শেষ করেই মিস সোমা দৌড়ে গেলো গাড়িখানা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে। কিন্তু অনেক আগেই গাড়ি চলে গেছে। মিস সোমা তাকালো এবার চিঠিখানার দিকে, তারপর হাতের পুটলিটার দিকে।

মুখোভাব বিষণ্ন হলো মিস্ সোমার।

সে এসেছিলো কিন্তু একটিবার দেখা করলো না। সেদিনের পর থেকে মিস সোমা কতদিন ওর প্রতীক্ষা করেছে। একটিবার ওকে দেখার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে আছে। এত কাছে এসেও সে দেখা করলো না। বড় নিষ্ঠুর সে। তাকে কেন সেদিন নদীবক্ষ থেকে রক্ষা করেছিলো। মিস সোমা ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলো অন্তপুরে।

নির্জন কক্ষে দরজা বন্ধ করে থলেটা খুলে ফেললো মিস সোমা। জীবনে এত মোহর সে কোনোদিন দেখেনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর থলেটার মুখ বেঁধে উঠে দাঁড়ালো। আপন মনে বললো সে–তুমি আমার দরজায় এসে চলে গেলে, একটি বার দেখা করে গেলে না বন্ধ

মিস সোমা প্রস্তুত হতে লাগলো ফাংহা দ্বীপে যাওয়ার জন্য।

সবাই অবাক হলো।

মিস সোমা হঠাৎ এত খাদ্যদ্রব্য কিনছে কেন। কি তার উদ্দেশ্য? এ নিয়ে শহরময় চললো নানা ধরনের আলোচনা। অনেকেই নানা রকম প্রশ্ন করে চললো।

একদিন মিস সোমার এক বান্ধবী বললো–সোমা, হঠাৎ তোর কি হয়েছে বলতো?

কেন?

তুই ঠিক আগের সেই সোমা নস।

তোর এ ধারণার মানে?

মানে সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে গেলি নৌকাবিহারে। তারপর বন্ধুরা ফিরে এলো, জানালো তুই চলে এসেছিস রাগ করে। আমরা উদ্বিগ্ন হলাম সবাই, কারণ তুই ফিরে আসিনি। তারপর যখন ফিরে এলি তখন এক অজানা বন্ধুর সঙ্গে।

মিস সোমার চোখে মুখে এক আনন্দদ্যুতি খেলে গিয়েছিলো, বলেছিলো–হাঁ, বন্ধুই বটে... আজও সেই কথার পুনরাবৃত্তি। মিস সোমা জবাব দিলো–অজানা বন্ধুর নির্দেশে আমাকে ফাংহা দ্বীপে যেতে হচ্ছে এবং ফাংহার অগণিত দুঃস্থ মানুষের মধ্যে আমি কিছু খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করতে চাই।

হঠাৎ এমন দয়া উদ্রেকের কারণ? বলে মিস সোমার বান্ধবী।

কারণ আজ নয়, বলবো একদিন বলে মিস সোমা।

তারপর সে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে নৌকায় খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধপত্র নিয়ে রওয়ানা দেয়। তাকে প্রথমে অনেকেই বাধা দেয় কিন্তু যখন মিস সোমা নাছোড়বান্দা তখন সবাই সহযোগিতা না করে। পারে না।

কারণ যে কাজে মিস সোমা আত্মনিয়োগ করেছে সে কাজ অতি মহৎ কাজ।

মিস সোমা সবার কাছে পায় প্রেরণা–উৎসাহ। অনেকেই তার সঙ্গী হিসেবে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

মিস সোমা যখন তার দলবল ও খাদ্য–বস্তু এবং ওষুধ নিয়ে ফাংহা দ্বীপে পৌঁছে তখন বনহুর আশাসহ কান্দাই এরোড্রামে এসে পৌঁছলো।

একটু পর বনহুর আশাসহ লণ্ডনের পথে রওয়ানা দেবে। বনহুরের শরীরে মূল্যবান স্যুট, চোখে কালো চশমা। আশা এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা হিসেবেই রওয়ানা দিচ্ছে। কেউ তাদের চিনতে পারবে না, কারণ তারা সম্পূর্ণ সাধারণ পোশাকে ছিলো।

এত সাবধানতা সত্ত্বেও কেউ বনহুরকে চিনে ফেললো এবং গোপনে পুলিশমহলকে জানালো। পুলিশমহল ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিলো বিমানের পাইলটকে।

অবশ্য বিমান আকাশে ভেসে ওঠার পর পুলিশমহল জানতে পারে এই বিমানে দস্যু বনহুর রয়েছে।

বিমানের পাইলটকে জানানো হলো কিন্তু বিমানটির যাত্রীরা কিছু জানলেন না। অবশ্য জানলে তাঁদের মধ্যে একটা ভীত আতঙ্কিত ভাব ছড়িয়ে পড়তো।

বনহুর যখন আশাসহ লণ্ডন বিমান বন্দরে পৌঁছলো তখন দেখলো বিমান বন্দরের চারপাশে অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। মুহূর্তে সব বুঝে নিলো বনহুর তার সাবধানতা সফল হয়নি। বিমান থেকে অবতরণ করার পূর্বমুহূর্তে বললো বনহুর–আশা, যে কারণে লণ্ডন এলাম তা বুঝি ব্যর্থ হলো। বিমান বন্দরে পুলিশ ফোর্স লক্ষ্য করছি। তারা হয়তো আমার শুভাগমন জানতে পেরেছে।

তাহলে এখন কি করা যায়। বললো আশা।

বনহুর বললো তুমি নিজেকে প্রস্তুত করে নাও। ওরা তোমাকে নির্যাতন করতে পারে।

কিন্তু

আমার জন্য ভেবো না…

বনহুর আশার হাত ধরে বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে।

সিঁড়ির মুখেই দুজন অস্ত্রধারী দাঁড়িয়ে ছিলো, আর ছিলেন দুজন পুলিশ প্রধান।

বনহুর সিঁড়ির শেষ ধাপ অতিক্রম করতেই বললেন একজন পুলিশ প্রধান–তোমাকে আমরা এরেষ্ট করলাম। পুলিশপ্রধান তাদের মাতৃভাষা ইংরেজিতে কথাটা বললেন।

বনহুর শান্তকণ্ঠে ইংরেজিতে জবাব দিলো–ধন্যবাদ। আপনারা আমাকে সঠিকভাবে অভিনন্দন জানালেন বলে।

বনহুর আর আশা এগুলো পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে।

এগুতে এগুতে বললো বনহুর–সত্যি আপনারা অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ! আমি এজন্য খুব খুশি হয়েছি।

তাই নাকি? বললেন পুলিশপ্রধান।

বনহুর হেসে বললো–হাঁ। তারপর সে বললো–এই মহিলা একজন অসহায়, অন্ধ। আমি তাকে লণ্ডন এনেছি তার চোখ দুটির চিকিৎসার জন্য। আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি সাধন করবো না।

বললেন পুলিশপ্রধান–ক্ষতি সাধন করো বা না করো, তুমি অপরাধী বে

শ, আমি মেনে নিলাম কিন্তু এর কি হবে? বললো বনহুর।

পুলিশপ্রধান বললেন–ওর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন লণ্ডন সরকার।

চমৎকার! আমি নিশ্চিন্ত। বলুন কোথায় যেতে হবে?

সামনে এগুলেই দেখতে পাবে।

ঠিকই, বনহুর এরোড্রাম পেরিয়ে আসতেই দেখতে পেলো দুটি পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। সামনের ভ্যানে বেশ কিছু পুলিশ রাইফেল নিয়ে এবং পেছনের ভ্যানেও কিছু পুলিশ, তাদের হাতেও রাইফেল।

সশস্ত্র পুলিশ পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় বনহুরকে পুলিশ ভ্যানে তুলে নেওয়া হলো।

পেছনের গাড়িতে নেওয়া হলো আশাকে।

এবার পুলিশ ভ্যানগুলো লণ্ডন বিমান বন্দর ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো রাস্তায়!

আলোয় আলোময় চারদিক!

বনহুর হাতঘড়িটা দেখে নিলো।

এখন দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি।

তাদের বিমান লণ্ডন বিমান বন্দরে অবতরণ করেছিলো একটা ত্রিশ মিনিটে।

বনহুর ভাবতেও পারেনি লণ্ডন বিমান বন্দরে পৌঁছেই তাকে এমন অবস্থায় পড়তে হবে। তবু সে একটুও ঘাবড়ালো না। সে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে এমন একটা ঘটনার জন্য। কে কোথায় কখন তাকে চিনে ফেলে তার কোনো ঠিক নেই। বিপদ তার সঙ্গে সঙ্গে চলে, এটা বনহুরের জানা আছে।

আলো ঝলমল প্রশস্ত রাজপথ।

লণ্ডনকে স্বর্গপুরী বলে মনে হচ্ছে। এত সুন্দর মনোরম পরিবেশটা এভাবে নষ্ট হয়ে গেলো। আশার দৃষ্টি নেই, সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার মনে ভীষণ এক দুর্ভাবনা দানা বেঁধে উঠছে–হঠাৎ একি হলো। আশার দৃষ্টিশক্তি যদি থাকতো তা হলে সে কোনো সময় এমন ঘাবড়ে যেতো না।

আশা জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলো।

গাড়িগুলো এগিয়ে যাচ্ছে।

মনোরম আলোর ঝলকানি চোখেমুখে এসে পড়ছে বনহুরের।

লণ্ডন বিমান বন্দর ত্যাগ করে অনেক দূরে এসে পড়েছে তারা। নির্জন পথ, হঠাৎ আলো। নিভে গেলো। লণ্ডনের রাজপথে এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর লাফিয়ে পড়লো নিচে।

গাড়িগুলো তখন লন্ডন কুইন ব্রীজ অতিক্রম করছিলো। বনহুর কুইনের নীল সচ্ছ পানিতে। ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো গাড়ি দুটো।

পুলিশবাহিনীর হুইসেল ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো কুইন ব্রীজের উপরিভাগ।

পুলিশপ্রধান নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। অন্যান্য পুলিশ তারাও নামলো এবং কুইন ব্রীজের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লো।

পাওয়ারফুর টর্চের আলো ফেলে কুইন ব্রীজের নীচে নদী বক্ষে বনহুরের সন্দান চললো। কিন্তু কোথাও বনহুরকে খুঁজে পেলেন না তারা।

লণ্ডন বিমান বন্দর থেকে কুইন ব্রীজ পর্যন্ত তারা বনহুরকে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেও তাকে আটক করে রাখতে পারলো না। নিজেদের ভুল তারা বুঝতে পারলো, কারণ বনহুরকে শৃঙখলাবদ্ধ না করে আনার জন্য তারা ভীষণ দুঃখিত হলো।

অনেক সন্ধান করেও পুলিশমহল হতাশ হলো। ওয়্যারলেসে জানানো হলো লণ্ডন পুলিশ ফাড়িগুলোতে। সমস্ত পুলিশমহলে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো ওয়্যারলেসে।

দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছিলো অথচ তাকে আটক করে পুলিশ অফিসের ফটকে নিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হলো না লণ্ডন পুলিশবাহিনী। ইলেকট্রিক গণ্ডগোল আজ পর্যন্ত রাজপথে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

সার্চলাইট এলো।

কুইন ব্রীজ খুলে ফেলা হলো। তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালানো হলো কিন্তু বনহুরকে পাওয়া গেলো না।

লণ্ডন পুলিশ অফিসে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার নিয়ে একটা আনন্দজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো, সেটা মুহূর্তে দমে গেলো। সবার মনে ছড়িয়ে পড়লো একটা আতংকের ছাপ। কুইন নদীর নীল পানিতে সার্চলাইটের আলো বিক্ষিপ্তভাবে নেচে বেড়াতে লাগলো। ছোট ছোট মোটর বোট নিয়ে পুলিশ বাহিনী ছড়িয়ে পড়লো কুইন নদীর বুকে।

বহু সন্ধান চালিয়েও যখন বনহুরকে খুঁজে পাওয়া গেলো না তখন গোয়েন্দা বিভাগ ছড়িয়ে পড়লো লণ্ডনের সর্বস্থানে।

সুন্দরী লণ্ডন নগরীর বুকে বিরাজ করতে লাগলো একটা ভয়ানক ভীতিভাব। লণ্ডনবাসী এতদিন দস্যু বনহুরের নামই শুধু শুনে এসেছিলো, এখন তারা অনুভব করছে তার অস্তিত্ব, যদিও তারা তাকে চাক্ষুষ দেখেনি তবু তারা জেনেছে স্বয়ং দস্যু বনহুর লণ্ডন নগরীতে আগমন করেছে এবং সে পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে কুইন নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হয় তার মৃত্যু ঘটেছে, নয় সে কুইন নদী থেকে উঠে এসে কোথাও আত্মগোপন করেছে।

সবার মনেই একটা আতংকভাব দেখা দিলো। না জানি কোন মুহূর্তে কোথায় তার আবির্ভাব ঘটবে।

লণ্ডন পুলিশবাহিনী একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে, যেমন করে হোক তারা দ বনহুরকে গ্রেপ্তার করবেই। এমন সুযোগ তারা বিফলে যেতে দেবে না।

দস্যু বনহুর শুধু কান্দাইয়ের কালোবাজারীদের আতঙ্ক নয়, সে সমস্ত বিশ্বের দুর্নীতিবাজদের ভয়ের কারণ। তাই লণ্ডনবাসীদের অনেকের মনেই গভীর দুশ্চিন্তা দেখা দিলো।

বহু বিদেশী লণ্ডনে আস্তানা গেড়ে অতি গোপন স্মাগলারী করে কোটি কোটি টাকা লুটছে লণ্ডন সরকারের চোখে ফাঁকি দিয়ে। এবার তাদের হৃদয় কাঁপছে।

তারা জানতো দস্যু বনহুরের কাছে কিছুই গোপন থাকবে না। সব তার নখদর্পণে।

বিশেষ করে মিঃ আওরঙ্গ সিং আর মিঃ শিবাজী মাইথী লণ্ডনে এসে নিজেরা অসৎ ব্যবস্থায় মেতে উঠেছে। তারা লণ্ডন সরকারের চোখে ধূলো দিতে ছাড়েনি।

কিন্তু তাদের আসল রূপ তারা অতি সৎ–মহৎ ব্যক্তি। তাদের মত ব্যক্তি আর হয় না।

মিঃ আওরঙ্গ সিং আর শিবাৰী মাইথী হলো বোম্বের অধিবাসী। এরা দুজন বোম্বেতে সোনার কারবার করতে। লুটতো লক্ষ লক্ষ টাকা। তাদের তৃতীয় পার্টনার ছিলো মিঃ হিমাংশু নাথ।

মিঃ আই আর মিঃ শিবাজী মাইধীর ব্যবসায়ে যে অর্থ ছিলো তাদের দুজনের সমান ছিলো মিঃ হিমাংশুর একার ক্যাশ তাই ব্যবসায় যা লাভ হতো তার এক ভাগ সম্পূর্ণ পেতো মিঃ হিমাংশু মাইথী আর একভাগ দুভাগে বিভক্ত করে পেতো মিঃ আওরঙ্গ আর মিঃ শিবাজী মাইথী।

এতে তারা মোটেই খুশি ছিলো না।

মিঃ আওরঙ্গ এবং মিঃ শিবাজী বলতো, আমরা সমান পরিশ্রম করবো আর হিমাংশু একা পাবে লভ্যাংশের দুভাগের সম্পূর্ণ একভাগ–এ হতে পারে না, তিন

ভাগ সমান হবে। এ ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে বচসা হলো, শেষে এই বচসাই হলো কাল।

একদিন হিমাংশুকে তারা কৌশলে হত্যা করলো।

সে এক নির্মম কাহিনী।

হিমাংশুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেলো দুই বন্ধু মিঃ আওরঙ্গ আর মিঃ শিবাজী বোম্বের অদূরে কোনো এক ডাকবাংলোয়। সেখানে বাঈজী নাচ ও মদপান চললো।

প্রায় সমস্ত রাত ধরে আনন্দ উৎসব করলো ওরা।

এক সময় হিমাংশুর দুচোখে নেমে এলো ঘুম।

আরামে ঢলে পড়লো সে বিছানায়।

মিঃ শিবাজী আর মিঃ আওরঙ্গের মধ্যে হলো দৃষ্টি বিনিময়। তারা সজাগ হয়ে শয্যা ত্যাগ করলো।

হিমাংশুর সঙ্গেই ওরা মদপান করেছিলো কিন্তু ওরা পরিমাণে কম পান করেছিলো এবং কৌশলে বেশি মদ পান করিয়েছিলো ওকে।

শয্যায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে হিমাংশু।

মিঃ আওরঙ্গ আর শিবাজী তাদের ব্যাগ খুলে বের করলো সূতীক্ষ্ণধার ছোরা।

ডিমলাইটের আলোতে সূতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা ঝকমক করে উঠলো।

মিঃ আওরঙ্গ ছোরাখানা নিয়ে হাজির হলো সোজা মিঃ হিমাংশুর বিছানার পাশে এবং মুহত বিলম্ব না করে সমূলে বসিয়ে দিলো ঘুমন্ত হিমাংশুর বুকে।

একটা তীব্র আর্তনাদ তারপর সব নীরব।

হিমাংশুর বুক থেকে ছোরাখানা টেনে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মিঃ আওরঙ্গ ডাকবাংলোর পাশের ঝিলে।

ঝুপ করে একটা শব্দ হলো মাত্র।

ফিরে এলো মিঃ আওরঙ্গ শূন্য হাতে।

হিমাংশুর হত্যার চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য লাশ তুলে নিলো ওরা দুজন বিছানাসহ। দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে উধাও হলো তারা।

কোথায় গেলো কেউ জানলো না।

তারপর একদিন বোয়ে ফিরে এলো।

ওরা দুবন্ধু মিঃ আওরঙ্গ আর মিঃ শিবাজী।

তখন বোম্বের ঘরে ঘরে মিঃ হিমাংশুর নিখোঁজ সংবাদ প্রচার হয়ে গেছে। পুলিশ জোর তদন্ত চালিয়ে চলেছে। গোয়েন্দা বিভাগ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

মিঃ আওরঙ্গ আর মিঃ শিবাজী মাইথীকে প্রায়ই পুলিশ নানা প্রশ্ন করে বসে। সময়ে অসময়ে। তারা বিরক্ত হয় এবং ভয়ও পায়। এমতাবস্থায় তারা দেশে বসবাস মোটেই সমীচীন মনে করলো না, তাই তারা সুদূর লণ্ডনের পথে রওয়ানা দিলো।

অবশ্য গোপনে চললো তাদের ব্যবসা সরিয়ে নেওয়ার পালা।

সফলকামও হলো তারা।

কৌশলে বোম্বে থেকে লণ্ডন।

জেঁকে ব্যবসা চালিয়ে চললো ওরা তবে প্রকাশ্য কেউ তেমন জানলো না এরা কারা।

লণ্ডন নগরীতে বনহুরের আবির্ভাব ঘটেছে শুনবামাত্র মিঃ আওরঙ্গ ও মিঃ শিবাজীর বুকটা কেঁপে উঠলো। তারা জানে এবং শুনেছে বনহুর কত সাংঘাতিক।

শুধু মিঃ আওরঙ্গ এবং মিঃ শিবাজী নয়, লণ্ডনের বুকে যারা গোপনে কালোবাজারী করছে তারা সবাই আতংকগ্রস্ত হলো।

বনহুর গেলো কোথায়?

ওদিকে পুলিশবাহিনী আশাকে নিয়ে গেলে পুলিশ অফিসে। তাকে নানাভাবে জেরা করতে লাগলো।

আশা ইংরেজি ভাষা জানে না, তাই অসুবিধা হলো লণ্ডন পুলিশবাহিনীর। তারা একজন দোভাষীকে নিজেদের সাহায্যের জন্য ডাকলো।

আশাকে তারা নানাভাবে প্রশ্ন করে চললো।

আশা কোনো জাবাব দিলো না, শুধু তার একটা মাত্র কথা–বনহুর তার কেউ নয়, তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলো তার চোখ দুটি অন্ধ হবার পর তাকে অসহায় জেনে সে ব্যথিত হয়েছিলো তাই।

কাজেই লণ্ডন পুলিশবাহিনী আশাকে কারাগারে বন্দী না করে চক্ষু চিকিৎসা হসপিটালে ভর্তি করে দিলো।

চললো আমার চক্ষু চিকিৎসা।

*

লণ্ডন পুলিশবাহিনী নানাভাবে সন্ধান চালিয়েও দস্যু বনহুরকে আবিষ্কার করতে পারলো না। এমন কি লণ্ডন গোয়েন্দা বিভাগও ব্যর্থ হলো।

পুলিশ প্রধান তিনি একটা সন্ধানীদলকে নিয়ে তাদের গোপন একটা স্থানে অটোমেটিক ক্যামেরা এবং টেলিভিশন নিয়ে বসলো।

ঐ টেলিভিশনে লণ্ডন নগরীর প্রায় স্থানগুলোই দেখা যাবে এবং প্রতিটা রাস্তার মোড়ে অদ্ভুত ক্যামেরা ফিট করা হলো। যে ব্যক্তিই পথে চলুক না কেন, সে ধরা পড়বে ঐ ক্যামেরায় এবং সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে তাকে দেখা যাবে। এমন কি যারা গাড়িতে থাকবেন তাদের ছবিও ক্যামেরায় ধরা পড়বে।

লণ্ডন বিমান বন্দরে বনহুর যখন পুলিশবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয় তখন কতগুলো ক্যামেরা তাকে ধরে রেখেছে। তাই পুলিশ মহলের চিনতে অসুবিধা হবে না বনহুরকে।

পুলিশমহলের এই সজাগ প্রচেষ্টাও এক সময় ব্যর্থ হলো।

বনহুর তাদের কোনো ক্যামেরায় ধরা পড়লো না।

আশাকে যে চক্ষু চিকিৎসা হসপিটালে রেখে চিকিৎসা চালানো হচ্ছিলো সেই হসপিটালেও কড়া পুলিশ পাহারা মোতায়েন করা হলো। তাদের ধারণা বনহুর নিশ্চয়ই ঐ হসপিটালে আসবে।

চক্ষু হসপিটাল।

আশা আট নম্বর ক্যাবিনে রয়েছে।

তার চক্ষু অপারেশনের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দস্যু বনহুর তাকে লণ্ডনে চক্ষু চিকিৎসা ব্যাপারে এনেছিলো, কাজেই তার চিকিৎসার যেন ক্রটি না হয় সেজন্য লণ্ডন সরকার অত্যন্ত কর্তব্যের সঙ্গে আশার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন।

আশা অন্ধ।

সে কিছু দেখতে পায় না।

অন্ধ না হলে সে বাংলা সংবাদপত্র পাঠ করে অনেক কিছু জানতে পারতো। বনহুর লঞ্চন পুলিশবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলো এবং পরে সে কুইন নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিখোঁজ হয়েছে–এ সংবাদটা সে জানতো। তারপর সে কোথায় গেলো তার কোনো সন্ধান সে জানে না। কেউ তাকে বলেনি, শুধু পুলিশমহল মাঝে মাঝে যখন তাকে জেরা করে তখন সে যতটুকু জানতে পারে, এর বেশি সংবাদ সে পায়নি।

আশার মন মোটেই ভালো না, সব সময় একটা চিন্তা তাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে। কারণ বনহুর তাকে নিয়েই এসেছিলো তারই চোখের চিকিৎসার জন্য। কত আশার বাসনা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে নিয়ে কান্দাই ফিরে যাবে কিন্তু তার কোনো আশা পূর্ণ হলো না। বিমানবন্দরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই বনহুরকে গ্রেপ্তার করা হলো।

আশা অনেক কথা ভাবছে, অনেক দুশ্চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। না জানি তার দৃষ্টিশক্তি আর ফিরে আসবে কিনা। আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেই বা লাভ কি, বনহুরকে যদি সে আর দেখতেই না পায় তাহলে তার এ জীবন দিয়ে কি হবে?

আশা ভেবে চলেছে, ডাক্তার এসে দাঁড়ান তার পাশে। বলেন–কেমন আছেন?

ডাক্তার এ কদিনে বেশ পরিচিত হয়ে উঠছেন আশার কাছে। শুধু ডাক্তার নন, তাঁর সহকারী মিঃ আরমানও বেশ পরিচিত হয়েছে, অতি ভদ্র ব্যবহার এদের সবার।

ডাক্তারের প্রশ্নে আশা একটু হেসে বললো–ভাল আছি।

আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। ডাঃ লর্ড আপনার চক্ষুদ্বয়ে অস্ত্রোপচার করবেন। তিনি অতি দক্ষ এবং সুনামধারী ব্যক্তি এ ব্যাপারে।

আশা একটু হেসে বললো–আমি জানি আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট করছেন।

ডাক্তার ও তার সহকারী চলে গেলেন।

আশা বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিলো। সে চিন্তা করতে না চাইলেও একরাশ চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। কত কথা আজ মনে পড়ছে তার। সুদূর লণ্ডনে বসে ভাবছে সে কান্দাইয়ের কথা, নূরী ও জাভেদের কথা এমন কি মনিরার কথাও তার মনে পড়ছে বারবার।

জাভেদ জানে না তার আব্বু আশাকে নিয়ে এসেছে সুদূর লণ্ডনে চক্ষু চিকিৎসার জন্য। জানলে ভাল হতো কারণ অহেতুক সে ভাববে।

এ কথা অবশ্য সত্য, আশাকে নিয়ে বনহুর লণ্ডনের পথে যাত্রা দেওয়ার পর জাভেদ এসেছিলো আশার কুটিরে। এসে বিমুখ হয়ে ফিরে গেছে কোথায় গেছে তার আশা আম্মু। বারবার সে ডেকেও সাড়া পায়নি, সাড়া না পেয়ে সন্ধান করেছে জভেদ সমস্ত কুটির এবং আঙ্গিনা।

কিন্তু কোথাও তাকে পায়নি খুঁজে।

জাভেদ ফিরে গেছে।

আশাকে না পেয়ে মন বিষণ্ণ হয়েছে জাভেদের। সে আস্তানায় ফিরেও মন খারাপ করে থাকে।

ফুল্লরা এগিয়ে আসে।

পেছন থেকে সে একটা জংলী ফুল ছুঁড়ে দেয় জাভেদের কোলে।

জাভেদ ফিরে তাকায় কিন্তু চমকে ওঠে না।

ফুল্লরা একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দেয়, ভাবে জাভেদ তার আগমন বুঝতে পেরে এগিয়ে আসবে।

কিন্তু জাভেদ তাকিয়ে মাথাটা ফিরিয়ে নেয়।

ফুল্লরার মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়, সে এবার ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে জাভেদের দিকে।

জাভেদ ফুল্লরার পদশব্দ শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং চলে যায় আস্তানার ভিতরে।

ফুল্লরা নীরবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে শূন্য পাথরখণ্ডটার দিকে।

জাভেদ আস্তানার ভিতরে প্রবেশ করতেই নূরী বলে–কি হয়েছে জাভেদ, তোর মন এত খারাপ কেন?

জাভেদ বলে–আম্মু, আশা আম্মির ওখানে গিয়েছিলাম তাকে দেখলাম না।

সেকি রে, বেচারী অন্ধ ভালভাবে খোঁজ করে দেখেছিস তো?

হাঁ।

তবে সে গেলো কোথায়?

জানি না।

আহা বেচারী জাভেদ বাপু, তুই তাকে খুঁজে বের কর, হয়তো বা সে কোথায় ভুলে চলে গেছে।

আম্মু, আমি তার কুটিরের আশেপাশে সব জায়গায় তাকে খুঁজেছি, কোথাও পাইনি।

তাহলে কি আশাকে কেউ হত্যা করে নিখোঁজ করেছে।

জানি না। কিন্তু আশা আম্মিকে যদি কেউ হত্যা করে থাকে তাকে আমি খুঁজে বের করে হত্যা করবো। জাভেদ দাতে দাঁত পিষে কথাটা বললো।

এখানে সুদূর কান্দাইয়ে বনহুরের আস্তানায় যখন জাভেদ এবং নূরীর কথা হচ্ছিলো তখন লণ্ডন চক্ষু হসপিটালে আশা চক্ষুর চিকিৎসাধীন রয়েছে।

হসপিটালে আশার দেখাশোনা করতো একজন যুবতী নার্স। ওর নাম রীমা। মেয়েটা খুব ভালো। সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ। সেবাই তার ব্রত, তাই মিস রীমা এসেছে সুদূর লণ্ডন সেবা করার জন্য।

মিস রীমার মুখমণ্ডল ভাবাচ্ছন। কারণ ডাক্তার বলেছেন অপারেশনে রোগিনীর চক্ষুদ্বয় সুস্থ নাও হতে পারে, তবে চেষ্টার ত্রুটি হচ্ছে না, হয়তো ভাল ফলও হতে পারে।

আশার সঙ্গে মিস রীমার পরিচয় হবার পর থেকে বেশ একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে ওর। বিশেষ করে বহদুর থেকে এসেছে আশা, তার সঙ্গী কেউ নেই যে তার খোঁজখবর নেয়।

একা বড় অসহায় সে।

মিস রীমার খুব ভাল লেগেছে আশাকে, তাই সে আশাকে আপা বলে ডাকে।

মিস রীমাকে আশা চোখে না দেখলেও তার কণ্ঠস্বর, তার আচরণ তাকে অভিভূত করেছে। ওর সেবাযত্নে আশা খুব সন্তুষ্ট, কারণ নিজ বোনের মত সেবাযত্ন করে সে।

আশা তৃপ্ত।

মিস রীমা যে আশা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ তা নয়। সে জানে স্বয়ং দস্যু বনহুর তাকে নিয়ে এসেছিলো সঙ্গে করে লণ্ডনে। উদ্দেশ্য ছিলো তার আশার চক্ষুদ্বয় চিকিৎসার দ্বারা সেরে তোলা কিন্তু সে সুযোগ তার আসেনি। লণ্ডন বিমান বন্দরে পৌঁছবার পূর্বেই লণ্ডন পুলিশবাহিনী ওয়্যারলেসে জানতে পেরেছিলো উক্ত বিমানে দস্যু বনহুর আসছে।

বিমান লণ্ডনের আকাশে পৌঁছার পূর্বেই পুলিশবাহিনী বিমান বন্দর ঘিরে ফেলেছিলো, কাজেই বনহুর সুযোগ পায়নি আশার সঙ্গে কোনো কথা বলার। যা সামান্য একটু বলেছিলো যখন বনহুর বুঝতে পারলে তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

আশার কানে সেই কণ্ঠস্বর সর্বক্ষণ প্রতিধ্বনি জাগায়। আনমনা হয়ে যায় তখন আশা। ভাবে সে গভীর মনোযোগ সহকারে। না জানি কোথায় সে।

মিস রীমা এসে দাঁড়ায় আশার পাশে, কাঁধে হাত রেখে ডাকে–আশা আপু!

তাড়াতাড়ি চোখ মোছে আশা–কে, বোন রীমা?

হাঁ। কি ভাবছিলে?

না, কিছু না।

তোমার চোখে পানি দেখলাম।

ও কিছু না।

তুমি লুকোচ্ছো। সত্যি বলো কার কথা ভাবছ?

একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠে আশার ঠোঁটের ফাঁকে।

বলে মিস রীমা–তুমি প্রায়ই ভাবো এবং মাঝে মাঝে ভীষণ আনমনা হয়ে যাও। সত্যি তুমি কি তারই কথা ভাবো যে তোমাকে লণ্ডন নিয়ে এসেছে?

বলে আশা–হাঁ বোন!

কিন্তু সে যে একজন বিখ্যাত দস্যু।

তবু তো সে মানুষ।

মানুষ হলেও সে অমানুষ, কারণ তার হৃদয় বলে কোনো জিনিস নেই। থাকলে সে দস্যুতা করতে পারতো না, তবে তোমাকে সে হয়তো দরদ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে

না না, ওর সম্বন্ধে কিছু বলল না। রীমা, তাকে দেখোনি, জানো না, তাই তার সম্বন্ধে এ কথা বলছো।

আশা আপু, আমি জানি তুমি তাকে ভালবাসো। একদিন আমি তোমার কথাবার্তায় যত টুকু বুঝতে পেরেছি তাতে তোমার অন্তরের কথা জানতে আমার ভুল হয়নি।

রীমা, তুমি যা বলছে হয়তো সত্য

কথা শেষ হয় না আশার, সেখানে উপস্থিত হন ডাক্তার, তিনি বললেন–মিস রীমা, রোগিণীর অবস্থা আজ কেমন?

অনেকটা ভালো। বললো রীমা।

কাল ওর চোখে অস্ত্রোপচার হবে। ডাঃ লর্ড জানিয়েছেন। কথাগুলো বললেন ডাক্তার। তারপর তিনি চলে গেলেন।

রীমা বললো–আশা আপু, আপনার দৃষ্টি শক্তি ফিরে এলে কাকে আপনি প্রথম দেখতে চান বলুন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো আশা–এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছো রীমা? তুমি কি জানো না যা চায় মানুষ তা পায় না।

অনেক সময় কিন্তু পায়।

না, পায় না রীমা।

মিথ্যে কথা?

তবে আমি যাকে দেখতে চাই তাকে দেখতে পাবো।

হয়তো পেতে পারো যদি সম্ভব কিছু হয়।

রীমা!

বলো আশা আপু?

রীমা, আমি যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই তবে ওকে দেখতে চাই; কিন্তু জানি পাবো না। তা ছাড়া আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবো কিনা তাও

হেসে বললো রীমাতাও সন্দেহ আছে, তাই না?

হাঁ, বোন।

তুমি জানো না আশা আপু ডাঃ লর্ড–এর অপারেশন কোনোদিন বিফলে যায় না। তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেই পাবে।

তোমার কথা যেন সত্য হয় বোন। কথাটা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো আশা।

আশার চুলে রীমা হাত বুলিয়ে চললো।

*

আশার চোখে অপারেশন হয়ে গেছে।

ডাঃ লর্ড মন্তব্য করেছেন–অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে। রোগিণী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন বলে আশা করছি। ডাক্তারের সহকারী মিঃ আরমান সব সময় পাশে ছিলেন অপারেশন টেবিলে।

রোগিণীকে যখন বেডে আনা হলো তখনও মিঃ আরমান বেডের পাশে এলেন। মিস রীমাকে তিনি সর্বক্ষণ রোগিণীর পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানালেন।

গভীর রাত।

সমস্ত হসপিটাল নীরব।

মাঝে মাঝে রোগিণীদের যন্ত্রণাকাতর আঃ উঃ শব্দ ভেসে আসছে।

নার্স এবং ডাক্তারদের জুতোর শব্দও শোনা যাচ্ছে কোনো কোনো সময়।

আশার বেডের পাশে একটা আসনে হেলান দিয়ে বসে বসে বই পড়ছিলো রীমা। যদিও তার ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছিলো তবু সে যায়নি, ইচ্ছা করেই মিস রীমা ডাক্তারের কাছে পারমিশন নিয়ে আশার বেডের পাশে রয়েছে।

মনোযোগ সহকারে বইখানা পড়ছিলো রীমা।

হঠাৎ কে যেন তার পেছনে এসে দাঁড়ালো।

পদশব্দে বই থেকে চোখ তুললো মিস রীমা। দেখলো মিঃ আরমান এসে দাঁড়িয়েছেন।

মিস রীমা তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো–স্যার আপনি।

দেখতে এলাম রোগিণী কেমন আছে। বললো মিঃ আরমান।

মিস রীমা অবাক না হয়ে বললো–স্যার, আমি তো আছি, আপনি না এলেও…

আপনার খেয়াল আছে রোগিণীর দিকে, তাই না?

হা স্যার।

মিস রীমা, আপনি খুব কতপরায়ণ এ কথা ডাক্তার হুসাইন আমাকে বলেছেন।

একটু হাসলো মিস রীমা।

বললো মিস আরমান–তাহলে চলি।

আচ্ছা স্যার।

আরমান চলে গেলো।

মিস রীমা রোগিণীর দেহে চাদরটা ভালভাবে চাপা দিয়ে পুনরায় আসনে বসে বই মেলে ধরলো।

সেবাযত্নের ত্রুটি হচ্ছে না।

কদিনেই অনেকটা সুস্থ বোধ করছে আশা।

এক সপ্তাহ পর চোখের পট্টি খুলে দেওয়া হলো।

মিস রীমা কিন্তু প্রতিদিন রাতে আশার ক্যাবিনে ডিউটি বেছে নিয়েছে। আশাকে বড় ভাল লেগেছে ওর।

কখনও শিয়রে বসে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। কোনো সময় চুল আঁচড়ে বেঁধে দেয়, কোনো সময় বসে বসে গল্প শোনায়।

আগামীকাল আশার চোখের পট্টি খোলা হবে।

শিয়রে বসেই বই পড়ছে মিস রীমা।

মিঃ আরমান এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

মিস রীমা তখনও মনোযোগ সহকারে বই পড়ছে। একটা নার্সের জীবন কাহিনী। কোনো এক যুদ্ধে আহত হয় রোবান বার্ড। বীর রোবান বার্ড হসপিটালে ভর্তি হয় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। তার সেবাযত্নে এগিয়ে আসে নার্স মিস এলিনা। রোগীর সমস্ত দায়িত্ব পড়ে এলিনার উপর। সংজ্ঞাহীন বীর রোবান বার্ডকে দেখে অভিভূত হয় মিস এলিনা, তাকে সে ভালবেসে ফেলে। একদিন বীর রোবান বার্ড সুস্থ হয়ে ওঠে। তখন বিদায় মুহূর্তে মিস এলিনা তাকে বিদায় দিতে পারে না, তার হৃদয় জুড়ে বসেছে রোবান বার্ড। মিস এলিনা রোবান বার্ডকে বলে–তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো। মিস এলিনার কথা শুনে হাসে রোবান বার্ড, বলে আমি একজন সৈনিক, আমার কোনো নিজের পরিচয় নেই এবং নেই কোনো ঠিকানা। আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবো। মিস এলিনা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে। চলে যায় বীর রোবান বার্ড কিন্তু সে এক গভীর ক্ষত রেখে যায় মিস এলিনার বুকে

চমকে চোখ তোলে মিস রীমা–স্যার আপনি!

মিস রীমা, রোগিণী কি ঘুমাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আপনি আমার সঙ্গে একটু আসতে পারেন কি?

পারি স্যার।

আসুন।

মিঃ আরমানের সঙ্গে মিস রীমা চলে আসে ক্যাবিনের বাইরে।

বেলকুনিতে এসে দাঁড়ায়।

দুজন পাশাপাশি।

লণ্ডন নগরীর চোখ ঝলসানো আলো দুজনার চোখেমুখে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে।

বলে মিঃ আরমান–মিস রীমা।

বলুন।

আপনি কি আশাকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছেন না রোগিণীর প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন?

যদি বলি তাকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি ঠিক বড় বোনের মত

সত্যি মিস রীমা?

হা স্যার।

তাহলে আপনাকে একটা কথা বলতে পারি?

নিশ্চয়ই পারেন স্যার।

আমি মিঃ আরমান নই....

তাহলে... অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করে মিস রীমা।

আমি যদি সেই হই, যাকে লণ্ডন পুলিশবাহিনী খুঁজে ফিরছে।

ঢোক গিলে বলে মিস রীমা–আপনি! আপনি মানে আপনি…

হাঁ, আমি স্বয়ং দস্যু বনহুর।

আপনি!

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন কদিন পূর্বে যে ছবি আপনারা সংবাদপত্রে দেখেছিলেন এ মুখ সেই মুখ কিনা? দাড়ি গোঁফ খুলে ফেললো মিঃ আরমান।

মিস রীমার দুচোখে বিস্ময়।

দাড়ির অন্তরালে সুন্দর বলিষ্ঠ একটা তেজোদ্দীপ্ত মুখ। মিস রীমা সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না।

একটু হেসে মিঃ আরমানবেশী দস্যু বনহুর দাড়ি–গোঁফ পরে নিলো দ্রুতহস্তে, তারপর বললো–রোগিণী হয়তো জেগে উঠে থাকবে তখন সে আপনাকে না দেখে বিচলিত হবে। এবার চলুন মিস রীমা!

মিস রীমার চোখে তখন বিস্ময়, সে অস্ফুট কন্ঠে বললো–তাহলে মিঃ আরমান কোথায়?

বললো বনহুর–তাকে যত্নসহকারে আমি রেখেছি। ঠিক সময়মত সে ফিরে আসবে। মিস রীমা, এই লণ্ডন নগরীতে শুধু আপনিই জানলেন দস্যু বনহুর কোথায় অবস্থান করছে এবং সে কে। আপনি আশাকে যদি সত্যি ভালবেসে থাকেন তবে আমার সম্বন্ধে কাউকে বলবেন না।

মিস রীমা বললোনা, কাউকে বলবো না তবে আশাকে…

তাকেও এখন বলা উচিত হবে না।

সে যে আপনাকে দেখতে চায় যেদিন তার চোখের পট্টি খোলা হবে।

বলবেন সে যা চায় তা হবে।

সত্যি বলবো?

হ্যাঁ, কারণ আমি তার সামনে উপস্থিত থাকবো।

কি বলে যে আপনাকে

না, আমাকে কোনো কিছুর দরকার নেই।

কিন্তু

আপনি আমাকে মিঃ আরমান বলেই ডাকবেন।

দস্যু বনহুর আপনি! এত মহৎ আপনার হৃদয় অথচ পৃথিবীর মানুষ জানে আপনি একজন ভয়ংকর কিছু।

আসলেও তাই মিস রীমা।

না, আমি বিশ্বাস করি না। কারণ আপনি যা, তা আমরা জানি না আর জানি না বলেই আপনার সম্বন্ধে এমন ধারণা আমাদের।

চলুন মিস রীমা।

কোথায়?

রোগিণীর ক্যাবিনে।

চলুন।

মিঃ আরমানবেশী দস্যু বনহুর মিস রীমাকে আশার ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে চলে যায়।

মিস রীমা ভাবতে থাকে। আজ যার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলো সে মানুষ না দেবতা। তার কণ্ঠস্বর এমন পৌরুষদীপ্তভাবে গম্ভীর। চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল। প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, নীল দুটি চোখে অন্তর্ভেদী চাহনি, সে দৃষ্টি যেন হৃদয় স্পর্শ করে। অপূর্ব এক পুরুষ এই দস্যু বনহুর।

রীমার মনটা হঠাৎ এক অভূতপূর্ব অনুভূতিতে ভরে ওঠে। ভাবতে থাকে সত্যি আশা তাকে কেন এত ভালবাসে। মনে পড়ে প্রায়ই মিঃ আরমান এসে আশার

বেডের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আশার জন্য তার যেন ভাবনার অন্ত নেই। অপারেশান টেবিলের পাশে মিঃ আরমানের চোখেমুখে একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। মিস রীমা লক্ষ্য করলেও আর কেউ তেমনভাবে লক্ষ্য করেনি।

দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য লণ্ডন পুলিশবাহিনী এবং ডিটেকটিভ মহল এ হসপিটালেও কড়া নজর রেখেছে। সেই কড়া নজর ভেদ করে মিঃ আরমানবেশী দস্যু বনহুর বিরাজমান এই চক্ষু হসপিটালে।

সত্যি বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

মিস রীমা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো।

কেমন করে স্বয়ং দস্যু বনহুর এমন রূপ নিলো। মিঃ আরমানকে সরালই বা কেমন করে। তাকে রাখলোই বা কোথায়? মিস রীমার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো।

আশা পাশ ফিরে বললো–বোন রীমা!

এগিয়ে এলো মিস রীমা হাতের বইখানা রেখে একটু ঝুঁকে বললো–বলল, এই তো আমি?

আশা বললো–একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম বোন।

দুঃস্বপ্ন! ও কিছু না।

বুকটা কেমন করছে।

মিস রীমা আশার বুকে হাত রেখে বলে–বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে কিনা তাই।

না, আমি দেখলাম সে এসেছিলো, আমাকে না দেখে ফিরে চলে যাচ্ছে। তারপর সে হসপিটালের বাইরে বেরুতেই পুলিশ তাকে ঘিরে ফেললো এবং হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো, তারপর তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চললো তাদের গাড়ির দিকে উঃ তারপর কি দেখলাম জানো বোন রীমা তাকে গাড়ির পেছনে শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে শুধু তাকিয়ে আছে আমার হসপিটালটার দিকে

হেসে বললো রীমা–সব মিথ্যা।

না, মিথ্যা নয় সত্য আমি যা দেখলাম সত্য।

ছিঃ এত উতলা হচ্ছে কেন? তার কিছু হয়নি। সে যেখানেই থাক সুস্থ আছে, ভাল আছে।

আমার স্বপ্ন তাহলে মিথ্যে।

হাঁ বোন, সব মিথ্যা।

তাই যেন হয়।

মিস রীমা আশার পাশে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

আজ রীমা স্তব্ধ হয়ে গেছে। সত্যি যাকে সে আজ দেখলো সে এক অদ্ভুত পুরুষ। আশা যা বলেছিলো তা সত্যি। যে তাকে দেখবে সে সহসা তাকে বিস্মৃত হতে পারবে না। আশার দৃষ্টিশক্তি নেই, হয়তো বা সে তাকে কোনোদিন দেখেনি তবু আশা তাকে ভালবাসে। শুধু ভালবাসে না, অন্তর দিয়ে সে তাকে কামনা করে। যেদিন তার চোখের পট্টি খুলে ফেলা হবে সেদিন আশা চায় তাকে দেখতে

আশার শিয়রে বসে ভাবছিলো মিস রীমা কথাগুলো। বলে উঠলো আশাবোন রীমা, কি ভাবছো?

ভাবছি পরশু তোমার চোখের পট্টি খুলে দেওয়া হবে।

সত্যি বলছো?

হাঁ বোন।

আবার আমি দেখতে পাবো তাহলে?

নিশ্চয়ই পাবে আশা আপু।

কিন্তু

কোনো কিন্তু নেই–উচ্ছল কণ্ঠে বললে মিস রীমা।

আশা শয্যায় উঠে বসলো, দুগন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

বললো মিস রীমা–তুমি কাঁদছ?

রীমা, সত্যি কি সে আর কোনোদিন আমার পাশে ফিরে আসবে না?

মিছামিছি কেন উতলা হচ্ছে আশা আপু?

না না, মিছামিছি নয়। কি হবে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে? আমি চাই না এ দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতে।

মিস রীমা আশার মাথাটা টেনে নেয় বুকের মধ্যে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলে–যা চাইছ তা পাবে আশা আপু।

রীমা!

হাঁ

রীমা, তোর কথা যেন সত্য হয়।

তুমি এত ভালবাসো তাকে।

জানি না। আশা নীরব হয়ে যায়।

মিস রীমাও নীরব।

কিছুক্ষণ কোনো কথা শোনা যায় না।

রাত্রির নিস্তব্ধতা আরও গভীর মনে হয়।

বলে আশা, পরশু আমার চোখের পট্টি খুলে দেওয়া হবে। আজ আমি কত খুশি, ফিরে পাবো আমার দৃষ্টিশক্তি কিন্তু সব খুশি আমার মুছে গেছে রীমা।

বললাম তো তুমি যা চাইছে তা হবে। তুমি তাকেই দেখতে পাবে। আশার মুখে একটা ম্লান হাসির রেখা ফুটে ওঠে। বলে সে–মিছেমিছি সান্ত্বনা দিচ্ছে।

আশার কণ্ঠস্বর মিস রীমার হৃদয় স্পর্শ করে।

কিছু বলতে যাচ্ছিলো মিস রীমা, ঠিক ঐ মুহূর্তে মিঃ আরমান এসে দাঁড়ায় সেখানে।

মিস রীমা নিশ্চুপ হয়ে যায়।

তার মনে একটা আনন্দ হিল্লোল দোলা দেয়। জানে মিস রীমা কে এই আরমান। তাই তার চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো।

মিঃ আরমান বললো–রোগিণীকে বেশি কথা বলতে দেবেন না। ওকে শুইয়ে দিন।

মিস রীমা বুঝতে পারলো মিঃ আরমানিবেশী দস্যু বনহুর তাকে এর বেশি কিছু বলতে দিতে চায় না। তাই সে বললো–আচ্ছা স্যার, আমি ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসছি।

মিস রীমা আশাকে বিছানায় যত্নসহকারে শুইয়ে দিয়ে চলে যায়।

আশা ভাবে রীমার কথাগুলো।

বারবার তার মনের আকাশে ভেসে উঠছে ঐ একটা মুখ। যে তাকে সঙ্গে করে এই দূরদেশে নিয়ে এলো কিন্তু তার পাশে থাকার সুযোগ পেলো না।

আশার চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত হয়ে উঠলো।

*

আশার চোখের ব্যাণ্ডেজ আজ খোলা হবে।

আশাকে হসপিটালের ড্রেসিং টেবিলে বসানো হয়েছে।

নার্স এবং ডাক্তার তার ড্রেসিং টেবিলের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

একপাশে দাঁড়িয়ে মিস রীমা।

সামনে মিঃ আরমান।

ডাক্তার ধীরে ধীরে চোখের পট্টি খুলে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠলো।

ডাক্তার আশাকে লক্ষ্য করে বললেন–আপনি আস্তে আস্তে চোখ মেলুন।

আশা চোখ মেললো।

অতি সন্তর্পণে।

আলোতে আলোময় সমস্ত কক্ষ।

আশা চোখ মেলতেই দেখলো একটা মুখ। সে মুখ আরমানের। মুখে দাড়ি–গোফ, সুষ্ঠ বলিষ্ঠ দেহ। চোখ দুটিতে অন্তর্ভেদীদৃষ্টি।

ঐ চোখ দুটি যেন নীরবে তাকে অভিনন্দন জানালো।

বললো ডাক্তার–আপনি দেখতে পাচ্ছেন?

আশা বললো–হাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি?

মিস রীমা আশার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো–যাকে তুমি দেখতে চেয়েছিলে, তাকে দেখতে পাচ্ছো

আশার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠলো, চিনতে তার ভুল হলো না। ঐ চোখ দুটো তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আশার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো আনন্দ অশ্রুধারা।

ডাক্তার বললেন–আপনি কাঁদছেন কেন? আশা করি যে কারণে আপনাকে আনা হয়েছিলো এই সুদূর লণ্ডনে তা সফল হলো।

জবাব দিলো না আশা।

সে শুধু মাথাটা একপাশে কাৎ করে মেঝের দিকে তাকালো।

মিস রীমা আশার কাঁধে হাত রাখলো।

মিঃ আরমান বললো ডাক্তার রোগিণীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

হাঁ মিঃ আরমান, আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

মিস রীমা বললো–আশা, বলো তুমি কি সব দেখতে পাচ্ছো?

আশা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললো–হাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আমি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছি

ঐ মুহূর্তে সবার মুখেই একটা আনন্দ উচ্ছল প্রসন্ন ভাব ছড়িয়ে পড়লো।

সবাই অভিনন্দন জানালো ডাক্তারকে।

মিঃ আরমানও সবার সঙ্গে ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানালো।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন এ ব্যাপারে কারণ আরমান তার সহকারী।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে তাকাতেই আরমান একটু হেসে বললো–স্যার ভুল হয়ে গেছে।

বললেন ডাক্তার–না ভুল নয়, রোগিণীর জন্য আপনিও আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে সহযোগিতা করেছেন যার জন্য আমি নিজেও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিঃ আরমান।

মিঃ আরমানবেশী দস্যু বনহুর একটু হাসলো মাত্র।

সবাই বিদায় গ্রহণ করার পর মিস রীমা কিছুক্ষণ বসলো আশার পাশে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে। একমাত্র মিস রীমাই জানে দস্যু বনহুর কোথায় এবং কোন অবস্থায় আছে।

রীমা হেসে বললো–আশা আপু, তুমি যাকে দেখবে বলে আশা করেছিলে তাকেই দেখছে।

বোন রীমা, আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। শুধু যাকে দেখতে চেয়েছিলাম তাকেই দেখিনি, দেখেছি আমার প্রিয় বোন রীমাকে। আশা কথাটা বলে রীমাকে কাছে টেনে নেয়।

রীমা দাঁড়িয়েছিলো বেডের পাশে।

আশা রীমার বুকে মাথা রাখলো।

বললো রীমা, আশা আপু–তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে এ জন্য আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। ভোমার আগমন শুভ হোক। রাত অনেক হয়েছে এবার ঘুমাও।

আশাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রীমা অল্পক্ষণের জন্য বেরিয়ে গেলো।

আশা চোখ মুছলো।

কতদিন পর সে আবার পৃথিবীর আলো দেখতে পেলো। আবার সে দেখলো তার প্রিয়জনকে। তার দুটি চোখ তাকে অভিনন্দন জানালো। সত্যি তার চিনতে ভুল হয়নি।

এমন সময় তার অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর আশার কানে প্রবেশ করলো–আশা!

. চমকে চোখ মেললো আশা–তুমি!

আশা, তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, এ আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি আমি, তুমি আমার পাশে রয়েছে বলে। সত্যি আমি এত বেশি চিন্তিত ছিলাম....

অহেতুক তুমি ভেবেছো আশা।

বনহুর আশার মাথায় হাত রাখলো।

এমন সময় শোনা গেলো ভারী বুটের শব্দ।

মিঃ আরমানবেশী বনহুর দ্রুত সরে দাঁড়িয়ে আশার হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে পালস্ পরীক্ষা করতে লাগলো।

ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন।

পিঠ চাপড়ে দিলেন তিনি, বললেন–মিঃ আরমান, আপনিই একমাত্র নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। কর্তব্য পালনে কোনো রকম অবহেলা করেন না।

হাসলো আরমান।

ডাক্তার তার ডিউটি শেষ করে চলে গেলেন।

বনহুর বললো–এবার যাত্রা শুরু হবে স্বদেশ অভিমুখে। আশা, তুমি আর একটু সুস্থ হলেই আমরা রওয়ানা দেবো..

বনহুর কথা শেষ না করতেই একটা আর্তচিৎকার শোনা গেলো হসপিটালের অভ্যন্তরে। বনহুর এবং আশা সজাগ হয়ে উঠলো।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর ছুটে গেলো হসপিটালের মধ্যে। দেখলো সে, একটা বেডের নিচে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে একটা নার্স। তার বুকে ছোরা বসিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

আর্তচিৎকারটা ছড়িয়ে পড়েছিলো গোটা হসপিটালের অভ্যন্তরে।

ডাক্তার-নার্স সবাই ছুটে এলেন।

তারা অবাক হয়ে দেখলেন নার্সটার বুকে একটা ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে।

কে এই নার্স?

সবাই ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন নার্সটি মিসেস জ্যাসিলিন।

ডাক্তার রুমালে চোখ ঢাকলেন।

মিস রীমা কখন এসে দাঁড়িয়েছে মিঃ আরমানবেশী দস্যু বনহুরের পাশে।

সবার চোখেমুখে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো একটা ভীতিভাব।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে ফোন করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ অফিসারসহ পুলিশপ্রধান এলেন। মনোযোগ সহকারে লাশ পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি এ হত্যাকে রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড বলে জানালেন।

মিসেস জ্যাসিলিন লেবনীয় মেয়ে। তিনি এসেছিলেন লেবানন থেকে প্রায় দশ বছর পূর্বে। লণ্ডন এসে তিনি কোনো এক হোটেলে চাকরী করেন, তারপর এক সময় চক্ষু চিকিৎসালয়ে আসেন নার্স হয়ে।

অনেক দিনের ইচ্ছা তার জনসেবা কাজ করা। হয়তো সে কারণেই তিনি এসেছিলেন এই চক্ষু হসপিটলে এবং তিনি রোগীর সেবার মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছিলেন আত্মতৃপ্তি।

মিসেস জ্যাসিলিন অত্যন্ত সরল–সহজ মহিলা ছিলেন। তার মুখমণ্ডল সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতো। কোনো রকম ক্লান্তি বা বিষণ্ণতার ছাপ কোনো সময় পরিলক্ষিত হয়নি তার মুখমণ্ডলে। অলসতার কোনো ছাপ ছিলো না তার মধ্যে। যখন দেখা গেছে সবাই বিশ্রাম করছেন তখন মিসেস জ্যাসিলিন একা হসপিটালে রোগীদের বেডের পাশে ঘুরে ঘুরে দেখছেন, কারও গায়ে চাদরটা টেনে দিচ্ছেন, কারও বা মাথাটা ঠিকভাবে সোজা করে রাখছেন। পিপাসায় কোনো রোগী অস্থির হয়েছে, তাকে তিনি সযত্নে পানি পান করাচ্ছেন। এমনি ধরনের সেবায় মিসেস জ্যাসিলিন সদা ব্যস্ত থাকতেন। এমন নিষ্ঠাবান নার্সটিকে কে বা কারা এমন নির্মমভাবে হত্যা করলো, এ নিয়ে হসৃপিটালে ভীষণ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

ডাক্তার রুমালে চোখ মুছে বললেন–মিস জ্যাসিলিন ছিলেন এ হসপিটালের প্রাণকথা শেষ করেই তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করলেন।

মিঃ আরমান বললো–আমি যতদিন দেখেছি এ মহিলাকে একাগ্রতার সঙ্গে রোগীর সেবা করতে দেখেছি কিন্তু তিনিই আজ নিহত হলেন। এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে গভীর রহস্য।

মিস রীমার মুখমণ্ডল বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, ভয়ে–বিস্ময়ে আরষ্ঠ হয়ে গেছেন সে।

এমন সময় পুলিশপ্রধান বলে উঠলেন–এ হত্যাকাণ্ড রহস্যজনক বটে কিন্তু আমরা বলতে পারি এত হত্যাকাণ্ড মানে মিসেস জ্যাসিলিনকে নিহত করেছে কে?

ডাক্তার বললেন–স্যার, বলুন কে সেই খুনী? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।

আমি জানি এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে কার দ্বারা—-সে হচ্ছে দস্যু বনহুর।

মুহূর্তে হসৃপিটাল কক্ষে যেন বজ্রপাত হলো। সবাই তাকালো এ ওর মুখের দিকে।

ডাক্তার অকস্মাৎ ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন–আমার হসপিটালে দস্যু বনহুর, বলেন কি স্যার!

বললেন পুলিশ সুপার–আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ দস্যু বনহুর লণ্ডনেই অবস্থান করছে। এবং সে একজন বিশ্ববিখ্যাত ভয়ংকর দস্যু। তার মায়া–দয়া বলে কিছু নেই, বড় নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সে। তার অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

ডাক্তার বললেন–শুনেছি দস্যু বনহুরকে কান্দাই হাঙ্গেরী কারাগারে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি।

এ কথা সত্য। বললেন পুলিশ সুপার। আরও সত্য, বনহুর পুলিশমহলের চোখে ধূলো দিয়ে যা খুশি তাই করে যায়। এই যে দেখলেন কেমনভাবে আপনাদের চোখে ধূলো দিয়ে সে এমন সূক্ষ্মভাবে হত্যাকাণ্ড করে গেলো। একটু থেমে বললেন–যতই পুলিশমহলের চোখে ধূলো দিয়ে সে কাজ করে যাক, রেহাই পাবে না লণ্ডন পুলিশের কবল থেকে।

ডাক্তার বললেন–হাঁ, এ বিশ্বাস আমাদেরও আছে মিঃ লর্ড।

মিসেস জ্যাসিলিন কোনো অন্যায় করেছেন বলে মনে হয় না, কারণ তিনি ছিলেন একজন সরল–সহজ মহিলা।

সত্যি, আমরা ভাবতে পারিনি এমন একজন নিষ্ঠাবান নার্সকে কেউ এভাবে হত্যা করবে। কথাটা গম্ভীর ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন ডাক্তার।

লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো।

মিঃ আরমান নিন্দুপ দাঁড়িয়ে দেখছিলো, তার ললাটে একটা চিন্তারেখা ফুটে উঠলো।

মিস রীমা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলো মিঃ আরমানের মুখের দিকে।

মিসেস জ্যাসিলিনের মৃতদেহ তদন্তের পর মর্গে পাঠানো হলো।

সমস্ত হসপিটালে একটা গভীর আতঙ্কের ছায়া নেমে এলো। রোগীদের মধ্যেও একটা ভীতিভাব জাগলো। মিসেস জ্যাসিলিন ছিলেন তাদের স্নেহময়ী বোনের মত।

তিনি যখন রোগীদের বেডের পাশে এসে দাঁড়াতেন তখন রোগীদের মনে একটা বিরাট ভরসা এবং সান্তনা জাগতো। অনেকটা বোগ–যাতনা তাদের কমে যেতে যেন সেই মুহূর্তে।

এহেন সিষ্টারের আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা হসপিটালে একটা বেদনা ঘনীভূত হয়ে এলো।

জোর তদন্ত শুরু হলো।

গোয়েন্দা বিভাগ এই রহস্যজনক মৃত্যুর মূল সূত্র খুঁজে বের করার দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন। লণ্ডন সংবাদপত্রে প্রকাশ পেলো এই হত্যা রহস্যের কথা এবং তার সঙ্গে আরও একটা সংবাদ প্রকাশ পেলো–প্রখ্যাত দস্যু বনহুর এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক। তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হলো।

হাসলো আরমানবেশী দস্যু বনহুর।

*

লণ্ডনের একটা মনোরম হোটেল সানলাইট।

এগারো তলা বিশিষ্ট এই হোটেলটাতে সিনেমা হল, সুইমিং পুল, মনোমুগ্ধকর নাচঘর, খেলাধুলার সরঞ্জাম, এমনকি ছাদে বল খেলার মাঠও রয়েছে।

এই সানলাইট হোটেলের নয় তলার বিশিষ্ট এক কামরায় মিঃ আরমানবেশী দস্যু বনহুর নিজের বিশ্রামস্থল বা আস্তানা গড়ে নিয়েছে।

বনহুরের কামরার মধ্যে রয়েছে ড্রেসিরুম, বাথরুম। এ ছাড়া আছে রুমের পেছনে একটা বেলকুনি।

বনহুর মিঃ আরমানের ড্রেস খুলে, দাড়ি–গোঁফ খুলে সম্পূর্ণ নিজের পোশাকে এসে এই বেলকুনিতে বসে। এখানে সে গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা করে কিভাবে অগ্রসর হবে।

গতরাতে মিসেস জ্যাসিলিনের মৃত্যু তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। মিসেস জ্যাসিলিন একজন নিষ্ঠাবান নার্স ছিলেন। অন্ধ হসপিটালে তার সুনাম রয়েছে অনেক। সবাই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন কারণ তাঁর চরিত্র এবং চাল চলন ছিল অত্যন্ত ভদ্র। মিসেস জ্যাসিলিনের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিঃ আরমানেরবেশে তার দেখা সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তাও হয়েছে। কই কখনও তো তার মধ্যে কোনো অসৎ আচরণ বা ঐ ধরনের কোনো কিছু পরিলক্ষিত হয়নি। হলে নিশ্চয়ই সন্দেহ জাগতো। হয়তো বা কোনো রহস্যময় পরিবেশের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

বনহুরের সামনে ছোট্ট একটা টী টেবিল।

তার উপরে একটা সোনালী রংয়ের এ্যাসট্রে।

বনহুর একটার পর একটা সিগারেট পান করে চলেছে।

এ্যাসপ্রে প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে অর্ধ দগ্ধ সিগারেটে।

বনহুর কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না এই হত্যা রহস্যের। ছোট্ট টেবিলটার উপর ভাঁজ করা সংবাদপত্রটা তুলে নিলো হাতে, মেলে ধরলো সেই কলামটা চোখের সামনে যে কলামে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে মিসেস জ্যাসিলিনের রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের কথা। দস্যু বনহুর এ হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

হঠাৎ আপন মনে হাসলো বনহুর।

তারপর উঠে দাঁড়ালো।

পেপারখানা হাতে নিয়ে বেডরুমে প্রবেশ করলো।

অবশ্য বেডরুমে প্রবেশের পূর্বেই সে বৃদ্ধের বেশে সজ্জিত হলো, তারপর ড্রেসিং রুমের তালা খুলে প্রবেশ করলো ড্রেসিংরুমে।

চমকে মুখ তুললো মিঃ আরমান।

বনহুর সংবাদপত্রটা তার হাতে দিয়ে বললো–মিঃ আরমান, পড়ে দেখুন।

বনহুরের ড্রেসিংরুমে আটক রয়েছেন আসল মিঃ আরমান।

সে এক বিস্ময়কর কাহিনী মিঃ আরমানকে আটক করা।

বনহুর লণ্ডন পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে যখন আত্মগোপন করেছিলো তখন আশাকে নিয়ে যাওয়া হলো অন্ধ হসপিটালে। বনহুরের নিজেরও ইচ্ছা ছিলো এই হসপিটালেই আশার চোখের চিকিৎসা করবে কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েও সফল হলো কারণ বনহুর যা চেয়েছিলো তাই সে পেলো।

আশাকে যখন ঐ হস্‌পিটালে ভর্তি করা হলো তখন বনহুর সন্ধান করে চললো কোন্ কোন্ ডাক্তার বা সহকারী সেখানে কাজে নিয়োজিত আছেন। একদিন বনহুর এক বৃদ্ধ ব্যক্তির বেশে হাজির হলো কোনো রোগীর অভিভাবক সেজে। তখন মিঃ আরমানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে হস্‌পিটালে।

মিঃ আরমানের শারীরিক গঠন এবং কণ্ঠস্বর কতকটা নিজের মত মনে করলো। লোকের মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি–গোফ, প্রশস্ত ললাট, মাথায় ক্যাপ, চোখে চশমা।

একনজরে বনহুর আরমানকে পছন্দ করে নেয়, তারপর তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নেয় গভীরভাবে। মিঃ আরমান দিল্লীর অধিবাসী, ভাল ইংরেজি বলতে পারেন এবং মহৎ ব্যক্তি হিসেবে তার নাম আছে।

মিঃ আরমান লণ্ডনে বেশি দিন হয় আসেননি। মাস কয়েক হলো এসেছেন আর চাকরীও পেয়ে গেছেন আসার পর পরই চক্ষু হসপিটালে।

ভাগ্য তাঁর ভালো, চাী পেয়েই মিঃ আরমান সানলাইট হোটেলে নয় তলার বিশিস্ট এক কামরা ভাড়া করে সেখানে বসবাস করেন।

লণ্ডনে কোনো পরিবার–পরিজন না থাকায় মিঃ আরমান হোটেল সান লাইটকেই তার উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

বনহুর একদিন আরমানকে জানালো সে ঠিক তার পুত্রের মত, তাই তাকে বড় ভাল লাগে।

আরমান বৃদ্ধকে পিতার মতই শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে দেখখো এবং একদিন দাওয়াত করলে নিজ

বৃদ্ধবেশী বনহুর বিনা দ্বিধায় দাওয়াত কবুল করলেন। যা সে চেয়েছিলো তাই হলো।

মিঃ আরমান বৃদ্ধবেশী বনহুরকে নিয়ে পৌঁছলেন সানলাইট হোটেলে। নিজের কক্ষে নিয়ে বসালেন তিনি যত্ন সহকারে।

কফি এলো।

মিঃ আরমান তাঁর অতিথিকে কফি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ড্রেস পরিবর্তন করার জন্য ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করলেন।

ঐ সময় বৃদ্ধবেশী বনহুর কফিপাত্র হতে কফি ঢেলে নিয়ে পাত্রে কিছু ওষুধের গুড়া মিশিয়ে দিলো।

ততক্ষণে ফিরে এলেন মিঃ আরমান।

বৃদ্ধ কফিসহ নিজ কাপটা তুলে নিলো হাতে।

মিঃ আরমান পট থেকে কফি ঢেলে নিলেন এবং কফি পান করলেন।

বৃদ্ধবেশী বনহুর একটা গল্প করছিলো।

মিঃ আরমান আরামে নিশ্চিন্ত মনে কফি পান করে যাচ্ছিলেন। এক মিনিট, দুমিনিট তিন মিনিট।

ঢলে পড়লেন মিঃ আরমান।

একটু হাসলো বৃদ্ধবেশী বনহুর, তারপর মিঃ আরমানকে টেনে নিয়ে প্রবেশ করলো ড্রেসিংরুমে।

তারপর যখন বেরিয়ে এলো বনহুর তখন তাকে দেখলে কেউ টের পাবে না সে মিঃ আরমান নয়।

এরপর থেকে দস্যু বনহুর বনে গেলো মিঃ আরমান।

মিঃ আরমানের যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন তিনি নিজকে দেখলেন তার ড্রেসিংরুমের একপাশে নরম তুলতুলে বিছানায় শোয়া অবস্থায়। দরজা বন্ধ বাহির হতে, তাই তিনি বুঝতে পারলেন সেই বৃদ্ধ তাকে আটক করেছে কিন্তু কেন তাকে এভাবে আটক করা হলো?

সে প্রশ্নের জবাব তিনি আজও পাননি। তবে তাকে আটক রাখা হয়েছে এবং তাকে একদিন মুক্ত করে দেওয়া হবে সে কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বনহুর যখন মিঃ আরমানের কক্ষে মানে ড্রেসিংরুমে আসে তখন সে বৃদ্ধ বেশেই আসে। বনহুর মিঃ আরমানের সঙ্গে কোনো রকম অসং ব্যবহার করে না বরং অত্যন্ত আদর যত্ন করে।

ঠিক সময়মত বনহুর নিজ হাতে তাকে খাবার এনে দেয়। সিগারেট পান করতেন মিঃ আরমান, বনহুর তাকে সিগারেট দিতেও ভুলে না। এমন কি ড্রেসিংরুমের সব জিনিস মিঃ আরমান ব্যবহার করতেন। সঙ্গে বাথরুম, কোনো অসুবিধা ছিলো না তার।

বনহুর সংবাদপত্রটা হাতে দিলো মিঃ আরমানের।

মিঃ আরমান সংবাদপত্রটা হাতে নিয়ে মেলে ধরলেন। প্রথম দৃষ্টি পড়তেই বিস্ময়ে অস্কুটধ্বনি করে উঠলেন। বললেন–মিসেস জ্যাসিলিন নিহত হয়েছেন। তাকে দস্যু বনহুর হত্যা করেছে

বৃদ্ধবেশী বনহুর বললো–তাকে কে হত্যা করেছে সঠিক সন্ধান মিলবে ঐ দিন যেদিন আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা হবে।

মিঃ আরমান সংবাদটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন বৃদ্ধের মুখে।

মিঃ আরমানকে লক্ষ্য করে বললো বৃদ্ধ মিঃ আরমান–এ ব্যাপারে আমাকে আবার কিছুদিন লণ্ডন থাকতে হচ্ছে। ভেবেছিলাম আগামী সপ্তাহেই আপনাকে আপনার কামরায় মুক্ত করে দিয়ে চলে যাবো কিন্তু হলো না।

মিঃ আরমানের চোখ থেকে বিস্ময় কাটেনি, তিনি অবাক কণ্ঠে বললেন–আমি আপনার কথা। কিছু অনুধাবন করতে পারছি না।

না পারলেও চেষ্টা করতে হবে, কারণ আপনাকে এখানে আমি সখ করে আটক রাখিনি মিঃ আরমান।

মিঃ আরমান তখনও নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধের মুখের দিকে। সব যেন তার কাছে রহস্যময় মনে হচ্ছে। কে এই বৃদ্ধ, যাকে সে বিশ্বাস করে তার নিজ কক্ষে নিয়ে এসেছিল। তাকে এভাবে তারই কক্ষের ড্রেসিং রুমে বন্দী করে রাখার কারণ কি? অবশ্য কোনো সময় বৃদ্ধ। তাকে অযত্ন করেনি বা কোনো রকম অসৎ ব্যবহার করেনি।

বৃদ্ধ বললো–জানি সবকিছু আপনার কাছে রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। হাঁ, তা হবারই কথা। একদিন অবশ্য সব রহস্যের সমাধান হবে। মিঃ আরমান, একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো?

বলুন কি আপনার উদ্দেশ্য, একটা কেন, বহু রহস্য আপনার মধ্যে লুকিয়ে আছে। আমাকে এভাবে আটকে রাখার কারণ কি বলুন?

বলেছি তো সবই পরে জানতে পারবেন।

না, আজ তোমাকে বলতে হবে কথা শেষ না করেই হঠাৎ মিঃ আরমান বৃদ্ধের জামার কলার চেপে ধরলো।

হঠাৎ মিঃ আরমানের আক্রমণে বৃদ্ধবেশী বনহুর চমকে না উঠলেও ভড়কে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজকে সামলে নিয়ে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলো মিঃ আরমানের হাত দুখানা এবং ভীষণভাবে চাপ দিলে হাত দুখানার উপরে।

বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের চাপে মিঃ আরমানের হাত দুখানা আগলা হয়ে গেলো। বনহুর ওর হাত দুখানা নামিয়ে দিলো নিচে, তারপর বললো–মিঃ আরমান, বলেছি যে আপনাকে সব বলবো।

না আজই আপনাকে বলতে হবে। বললেন আরমান।

বৃদ্ধ বললো–বেশ বলবো তবে আপনাকেও কিছু বলতে হবে। কথাটা শেষ করে বৃদ্ধবেশী বনহুর বসলো মিঃ আরমানের শয্যার একপাশে।

মিঃ আরমানও বসলেন স্থির হয়ে।

চোখেমুখে তার বিস্ময় আর উত্তেজনার ছাপ।

বৃদ্ধ বসেই তার মুখের দাড়ি–গোঁফ খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে দুচোখ ছানাবড়া করলেন মিঃ আরমান। বললেন তিনি– একি, আপনি বৃদ্ধ নন! তবে যে আপনি

হাঁ, আমি বৃদ্ধের বেশে লণ্ডনে অবস্থান করছি।

কে আপনি।

আজ পরিচয় আমি দেবো না। তবে আপনাকে আমি কিছু প্রশ্ন করবো ঠিক জবাব দেবেন তাহলে যত শীঘ্র আপনাকে মুক্ত করে দেবো।

মিঃ আরমান নিশ্চুপ রইলেন।

বনহুর বললে–মিসেস জ্যাসিলিনের হত্যাকাণ্ড রহস্যজনক।

তাকে দস্যু বনহুর হত্যা করেছে বলে সংবাদপত্র জানাচ্ছে। কাজেই রহস্য উদ্ঘাটন হয়ে গেছে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে

না।

তাহলে কি আপনি মনে করেন দস্যু বনহুর তাকে হত্যা করেনি?

মিসেস জ্যাসিলিন দস্যু বনহুরের কোনো ক্ষতি সাধন করেননি কিংবা তিনি জনসাধারণের কোনো অন্যায় করেননি বরং তিনি এক মহৎপ্রাণ মহিলা ছিলেন …

দর কোনো নীতিবোধ নেই এ কথা আপনি জানেন নিশ্চয়ই।

তবু কারণ থাকতে হবে, বিনা কারণে কেউ কোনোদিন নরহত্যা করে না,তবে কারণ দুরকম হতে পারে। যেমন একটা প্রতিহিংসামূলক অপরটা হিংসাত্মকমূলক। প্রতিহিংসা এবং হিংসাত্মকের মধ্যে দুরকম উদ্দেশ্য আছে। যেমন প্রতিহিংসা–কোনো ব্যক্তি যদি কারও নিকটে হিংসাত্মক আচরণ পেয়ে থাকে তাহলে প্রতিহিংসাস্বরূপ সে ক্ষতিসাধন করতে সচেষ্ট হয়। আবার শুধু হিংসাত্মক স্বরূপ ক্ষতি সাধন করে অনেকে–সেটা হলো ঈর্ষাহিংসা ও কেন আমার চেয়ে বেশি ধনবান হলো কিংবা আমার চেয়ে বেশি সম্মানী হলো তখন, সে ব্যক্তি হিংসার বশীভূত হয়ে ক্ষতিসাধন করে বা করতে চেষ্টা করে। কাজেই আমার মনে হয়, মিসেস জ্যাসিলিনের সঙ্গে দস্যু বনহুরের এ দুটির একটারও কোনো সংযোগ ছিল না বা নেই। কাজেই দস্যু বনহুর মিসেস জ্যাসিলিনকে হত্যা করেনি

তাহলে কে তাকে হত্যা করেছে? বললেন মিঃ আরমান।

বনহুর বললো–যে মিসেস জ্যাসিলিনকে হত্যা করেছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সে ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন মিঃ আরমান।

আমি মিসেস জ্যাসিলিনের হত্যা ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। দুচোখে বিস্ময় নিয়ে বললেন মিঃ আরমান।

বললো বনহুর হাঁ, আপনি পারেন।

তাহলে আপনি কি গোয়েন্দা বিভাগের লোক

একটু হেসে বললো বনহুর–যদি তাই মনে করেন তবে হতেও পারি। যাক ও সব কথা, এবার বলুন মিসেস জ্যাসিলিনের সঙ্গে আপনার কি রকম পরিচয় ছিলো?

ভাল পরিচয় ছিলো।

জ্যাসিলিন কি আপনাকে ভাল চোখে দেখতেন?

আপনি কি মনে করছেন আমি মিসেস জ্যাসিলিনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছি।

তা বলছি না তবে হত্যা রহস্যের উদ্ঘাটন ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আর একটা কথা, আপনি কোনো সময় আমাকে ভুল বুঝবেন না, কারণ অনিচ্ছাসত্বেও আপনাকে আমি কষ্ট দিচ্ছি। মনে রাখবেন আমি আপনার বন্ধু।

বেশ, বন্ধু হিসেবে যদি মনে করেন তাহলে বলুন আপনি কে?

বলেছি জানাবো। সব জানতে পারবেন। এখন কয়েকটা প্রশ্ন করবো।

আচ্ছা করুন।

বললো বনহুর–জ্যাসিলিনের সঙ্গে আপনার পরিচয় ভালভাবে ছিলো বললেন?

হাঁ।

তিনি কেমন চরিত্রের মেয়ে ছিলেন?

ভালো। আমরা যতটুকু জানি তিনি একজন মহৎ চরিত্রের মহিলা ছিলেন।

আপনি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন?

করেছি। মানে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমরা সব সময় পেয়েছি। তার প্রিয়জনদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

আপনি ছাড়া আর কার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিলো?

আমি যতটুকু জানি সবার সঙ্গেই তার সদ্ভাব ছিলো।

তবুও আপনার কি কাউকে তার বেশি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে হয়েছে?

একটু চিন্তা করে বললেন মিঃ আরমান–হাঁ, বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিলো তার ডাক্তারের সঙ্গে। এ ছাড়া একটা ভুদ্রলোক আসতেন। তিনি মাঝে মাঝে মিসেস জ্যাসিলিনের সঙ্গে নিভৃতে কথাবার্তা বলতেন।

বনহুরের চোখ দুটো দপ্ করে যেন জ্বলে উঠলো। বললো সে–আপনি তাকে চেনেন?

না।

সে কোথাকার লোক?

তাকে দেখলে ঠিক বোঝা যায় না তবে লেবাননবাসীই হবে।

বয়েস কেমন?

মিসেস জ্যাসিলিনের চেয়ে দুএক বছরের বেশি হবে বলে মনে হয়েছে।

তার সঙ্গে কি আপনার পরিচয় ঘটেছিলো?

না।

তাকে আপনি কতবার দেখেছেন?

বহুবার।

আপনি তাকে দেখলে চিনবেন?

নিশ্চয়ই চিনবো।

মিসেস জ্যাসিলিন তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন।

একটু চিন্তা করে বললো মিঃ আরমান–ঠিক বুঝতে পারিনি তবে মাঝে মাঝে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে মিসেস জ্যাসিলিন ক্রুদ্ধভাবে কথাবার্তা বলতেন।

বনহুর বললো—হু।

বনহুর যখন গম্ভীর হয়ে ভাবছে তখন মিঃ আরমান বললেন–ডাক্তার লোমানের সঙ্গেও মিসেস জ্যাসিলিনকে কখনও কখনও রাগান্বিত হয়ে কথা বলতে দেখেছি। আমি জানি জ্যাসিলিন ডাক্তারকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতেন এ কারণে তাদের মধ্যে একটা প্রীতিভাব ছিলো। .

বললো বনহু–এর বেশি আমি আর কিছু জানতে চাই না। কারণ আমি যতটুকু জেনেছি তাই যথেষ্ঠ জ্যাসিলিন হত্যার জন্য। মিঃ আরমান, আপনাকে যদি আমার প্রয়োজন হয় আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

নিশ্চয়ই করবো, কারণ জ্যাসিলিন ছিলেন আমাদের সবার প্রিয়। তার এই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড আমাকে মর্মাহত করেছে।

বনহুর মিঃ আরমানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে করমর্দন করলো।

*

জাভেদ আশাকে তার কুটিরে না পেয়ে ফিরে এলো। গভীরভাবে চিন্তা করেও সে এর সমাধান খুঁজে পেলো না। তবু সে সন্ধান করে চললো আশার। জাভেদের যত বয়স বাড়ছে ততই সে বলিষ্ঠ পুরুষ আকারে রূপ নিচ্ছে। পিতার মতই সৌন্দর্যের অধিকারী জাভেদ।

চেহারা এবং বলিষ্ঠতায় জাভেদ পিতার মত হলেও লেখাপড়া বা শিক্ষা–দীক্ষায় সে মোটেই পিতার মত নয়। সে সম্পূর্ণ হিংস্র জন্তুর মত ভয়ংকর হয়ে গড়ে উঠলো।

জংগলের জীবজন্তু পশু–পাখি নিয়ে সবসময়ে সে থাকতে ভালবাসে তবে সবচেয়ে প্রিয় তার অশ্ব।

দেখতেও তেমনি, যেন একটা অদ্ভুত জীব। ঘাড়ের লোম বা চুলগুলো খাটো এবং সজারুর কাঁটার মত খাড়া। চোখ দুটো ক্ষুদ্র হলেও যেন চোখ দিয়ে আগুন

ছিটকে বের হয়।

জাভেদ যখন তার অশ্বপৃষ্ঠে বসে দৌড়াতে শুরু করতো তখন কান্দাই জংগলের পাথুরিয়া মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতো।

জাভেদের দেহে কোনো জামা থাকতো না।

সে সম্পূর্ণ খোলা শরীরে থাকতে ভালবাসতো।

খোলা শরীরেই সে তার অশ্ব নিয়ে ছুটতো যেখানে তার মন চাইতো সেখানে।

নূরীও তাকে ধরে রাখতে পারতো না।

নূরী যখন কথা বলতো তখন সে ওর মধ্যে দেখতে পেতো তার হুরের প্রতিচ্ছবি। সেই অট্টহাসি, সেই গম্ভীর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, দীপ্ত উজ্জ্বল চোখ, সেই প্রশস্ত ললাট…

নূরী বিস্ময়ভরা মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতত পুত্রের মুখের দিকে।

সেদিন যখন হন্তদন্ত হয়ে জাভেদ এসে বললো–আম্মু, আশা আম্মুকে খুঁজে পেলাম না।

নূরী চমকে উঠলো।

অবশ্য কারণ ছিলো তার চমকে ওঠার।

আশা অন্ধ।

সে দেখতে পায় না।

একা সে চলতে পারে না গভীর জংগলে।

অবাক কণ্ঠে বলেছিলো নুরী–তাহলে সে গেলো কোথায়?

বললো জাভেদ–আমিও সে কথা ভাবছি।

বেশ কিছুদিন হলো তোর বাপুও নিখোঁজ হয়েছে। সে কোথায় জানি না।

জাভেদ বললো–নিশ্চয়ই ঐ ছোঁকড়া গোয়েন্দা বাপুকে গ্রেপ্তার করে তাকে গোপনে আটক করেছে। আম্মু, তুমি কিছু ভেবো না, আমি বাপুকে উদ্ধার করে আনবো।

জাভেদ কথা শেষ না করেই আস্তানা থেকে বেরিয়ে গেলো।

পরক্ষণেই শুনতে পেলো নূরী জাভেদের অশ্বখুরের শব্দ। সে কোনো কথা বলবার সুযোগ পেলো না। একটা দুশ্চিন্তা নূরীর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। সেই ছোকরা গোয়েন্দার পরিচয় নূরী জানে, তাই তার মুখ বিষণ্ন হয়ে পড়লো।

নূরী যখন ভাবছে তখন রহমান এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

নূরীকে চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো রহমান–কি ভাবছো?

এইমাত্র জাভেদ চলে গেলো।

হাঁ, আমি শুনতে পেয়েছি ওর অশ্বপদশব্দ।

জানো রহমান ভাই, জাভেদ বলে কি?

কি বলে সে?

বলছে ওর বাপুকে নাকি ছোকরা গোয়েন্দাটি পাকড়াও করে আটকে রেখেছে। তার মানে নূর হুরকে বন্দী করেছে এবং সে কারণেই জাভেদ অশ্ব নিয়ে চলে গেলো।

একটিবার ও আমাকেও কোনো কথা বললো না।

সত্যি ওকে বড় উত্তেজিত মনে হলো। রহমান ভাই, যদি কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসে?

বড় দুশ্চিন্তা এ ব্যাপার নিয়ে। ওরা যে ওদের কত আপনজন এ কথা ওরা কেউ জানে না।

ওদের জানিয়ে দিলে কেমন হয়?

মোটেই তা উচিত নয়। কারণ তাতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল হবে বেশি। তা ছাড়া সর্দার চান না ওরা জানুক ওদের পরিচয়। তুমি তো জানো সর্দারের নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কারও নেই।

রহমান ভাই, তাহলে কি হবে?

কি আবার হবে, জাভেদ যখন জানবে তার বাপু গ্রেপ্তার হয়নি তখন সে ফিরে আসবে।

তবু আমার ভয় হচ্ছে।

নূরী, তুমি দস্যু বনহুরের সহধর্মিনী হয়েও এ কথা বলো? তোমার স্বামীর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে জাভেদের দেহে।

কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। আমার হুর শুধু অসীম শক্তিশালীই নয়, সে উচ্চশিক্ষিত। জ্ঞান–গরিমায় সে কোনো গুণী ব্যক্তির চেয়ে কম নয়। আর জাভেদ সে লেখাপড়া জানে না

একটু হেসে বললো রহমান–লেখাপড়া না শিখলেও সে তার বাপের মতই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান এবং অসীম শক্তির অধিকারী।

তুমি যতই বলল রহমান ভাই আমি জাভেদকে নিয়ে সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তায় ভুগছি।

মিছেমিছি তোমার এ দুশ্চিন্তা। চলো আস্তানার ভিতরে ফিরে চলো। রহমান নূরীকে নিয়ে। ফিরে এলো।

নূরী একটা আসনে বসে বললো–বসো রহমান ভাই তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রহমান অদূরে আর একটা আসনে উপবেশন করলো।

বললো নূরী–রহমান ভাই!

বলো?

সত্যি করে বলল হুর কোথায়?

রহমান বললো–আমি সঠিক জানি না।

আমি জানি সে তোমাকে না জানিয়ে কোথাও যাবে না বা যায় না।

বললো রহমান–সত্যি বলতে কি, অনেক সময় না বলেই সর্দার চলে যান এ কথা তুমিও জানো নূরী।

এবার হুর কোথায় গেছে?

বলেছি তো এবার তিনি আস্তানার কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেছেন।

কিন্তু....

নূরী, আমি আন্দাজকরেছি সর্দার আশার ওখানে গিয়েছিলেন। কারণ আশার অন্ধত্ব নিয়ে সর্দার প্রায়ই আলোচনা করতেন। কি ভাবে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা যায় এ নিয়ে চিন্তা করতেন তিনি।

নূরী বলে উঠলো–তাহলে কি হুর আশাকে নিয়ে কোথাও গেছে।

হ, আমার তাই মনে হয়।

নূরী বললো–আশা আপু আমার হুরের জন্য বারবার নিজের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে গেছে। ওর জন্য হুর কয়েকবার মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। সে যদি সত্যিই ওকে কোথাও চিকিৎসা ব্যাপারে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি তার জন্য আনন্দ প্রকাশ করবো। রহমান ভাই, তোমার অনুমান যেন সত্য হয়।

রহমান আর নুরী যখন কথা হচ্ছিলো তখন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে আসে কায়েস।

রীতিমত হাঁপাচ্ছিলো কায়েস, বললো রহমান–কি সংবাদ কায়েস

সংবাদ অত্যন্ত শুভ।

শুভ!

হাঁ রহমান ভাই। দুট্রাক মাল ধরা পড়েছে।

কেমন! কি মাল?

হিসমা ব্রীজের পাশে আমাদের যে অনুচরগণ আত্মগোপন করে পাহারা দিচ্ছিলো তারা ওয়্যারলেসে সংবাদ দিয়েছে। রহমান ভাই তুমি নিজে জেনে নাও।

রহমান নিজের জামার পকেট থেকে বের করলো ক্ষুদে ওয়্যারলেসটা, তারপর কথা বললো হিমা ব্রীজের অন্তরালে তাদের অনুচরগণ আত্মগোপন করে আছে তাদের সঙ্গে।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো ফুলমিয়ার কন্ঠস্বর রহমান ভাই, সরকারের কোনো এক স্বনামধন্য মন্ত্রী বাহাদুরের দুট্রাক চোরাই মাল আমরা ব্রীজের দক্ষিণ দিকের বনে অপেক্ষা করছি।

রহমান ক্ষুদ্র ওয়্যারলেসে মুখ নিয়ে বললো... তোমরা অপেক্ষা করো, আমরা আসছি।

কথা শেষ করেই রহমান উঠে দাঁড়ালো।

বেরিয়ে গেলো।

কায়েসকে লক্ষ্য করে বললো–যাও তৈরি হয়ে নাও, হিমা ব্রীজ অভিমুখে এক্ষুণি রওয়ানা দেবো....

কায়েস চলে গেলো এবং চারটি অশ্ব নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ফিরে এলো রহমানের পাশে।

রহমান কায়েসকে দেখেই বুঝতে পারলো সব প্রস্তুত।

তাড়াতাড়ি কায়েসকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলো রহমান আস্তানার বাইরে।

সোনালী রৌদ্রের ছটা কান্দাই জঙ্গলের অন্ধকার কিছুটা হাল্কা করে দিয়েছে।

অশ্বগুলো প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রহমান, কায়েস এবং আরও দুজন।

চারজন রওয়ানা দিলো হিসমা ব্রীজ অভিমুখে।

গভীর জঙ্গলের মাটি প্রকম্পিত হলো।

রহমান এবং তার সঙ্গীদের সবার দেহেই জমকালো পোশাক।

একটা হাত রহমান হারিয়েছে কিন্তু শক্তি তার কমেনি। বরং রহমান আরও বেশি শক্তির অধিকারী হয়েছে। রহমানের অশ্ব সর্বাগ্রে। দাঁতে অশ্ব বগা চেপে ধরে দক্ষিণ হাতে পিস্তল উদ্যত করে রাখে। যে কোনো বিপদের মোকাবেলা করতে রহমান পিছপা হয় না।

নূরী আর নাসরিন দাঁড়িয়েছিলো।

ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো।

মুখোভাব তার বিষণ্ন।

সদা হাস্যময়ী ফুল্লরাকে বিষণ্ন মুখে এসে দাঁড়াতে দেখে নূরী বললো– কি ফুল্লরা? অমন গম্ভীর মুখ কেন?

ফুল্লরা কোনো জবাব না দিয়েই চলে যাচ্ছিলো।

নূরী ডাকলো–শোন ফুল্লরা!

ফুল্লরা না শুনে পারলো না, সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বললো নূরী–কি হয়েছে বলো মা মণি?

ফুল্লরা বললো–আম্মি, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে রাগ করে ও আমাকে মন্দ কথা বললো।

নূরী ফুল্লরার চিবুকে আদর করে নাড়া দিয়ে বললো–কার কথা বলছিস ফুল্লরা?

নাসরিন বললো–নূরী আপা, তুমি বুঝতে পারছে না কার কথা সে বলছে। জাভেদ, তখন দেখলাম জাভেদের সঙ্গে কথা বলছে।

হেসে বললো নূরী–ও এবার বুঝেছি। আচ্ছা আসুক সে ফিরে, তারপর আমি কেমন বকা বকেছি, তখন ও দেখবে মজটা। যা ফল্লরা মন খারাপ করিসনে।

ফুল্লরা চলে গেলো।

নাসরিনকে লক্ষ্য করে বললো নূরী–হুরকে ভালবেসে আমি কত নাজেহাল হয়েছি। আমার ভালবাসার বিনিময়ে পেয়েছি তার কাছে শুধু অবহেলা... বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে নূরীর গলা। একটু থেমে বলে–তারই তো সন্তান জাভেদ!

নাসরিন বললো–বয়সই বা ওদের কি হয়েছে, এমন একটু হবেই। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

বললো নূরী–কিন্তু জয়ী হতে পারবে তো ফুল্লরা?

কেন পারবেনা? তুমি জয়ী হয়েছে, জয়ী হয়েছি আমি। ফুল্লরাও জয়ী হবে একদিন।

কিন্তু জাভেদ যেন সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। বললো নূরী।

হলে কি হবে, একদিন দেখো জাভেদই ফুল্লরার সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে। আচ্ছা বোন নূরী, ফুল্লরাকে জাভেদের সঙ্গে কেমন লাগে?

এ প্রশ্ন আমাকে না করে নিজের মনকে কর নাসরিন।

তুমি যা বলছো সত্যি।

নাসরিন আর নূরী মিলে যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন এসে উপস্থিত হলো বৃদ্ধ দাইমা। সে এখন খুব বুড়ো হয়ে গেছে তবু সে লাঠি ধরে দীরে ধীরে চলতে পারে।

বৃদ্ধ হলেও দাইমা কিন্তু সদা হাস্যময়ী।

সব সময় সে ঘুরে ঘুরে খোঁজখবর নেয় কে কেমন আছে, কে কোথায় আছে, কে কি খেলো এমনি কত কি। মাঝে মাঝে ঝিলের ধারে বসে গান গায়, সেই পুরোনো দিনের গান।

দাইমাকে দেখলে সবাই খুশি হয়, সবাই তার কুশল জিজ্ঞাসা করে। হেসে জবাব দেয় দাইমা–ভাল না থেকে পারি। আমি ভাল না থাকলে তোদর দেখবে কে?

দাইমার কথা সত্য।

তবে হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবে না সে, কারণ খুব বুড়িয়ে গেছে দাইমা।

নূরী আর নাসরিনের কথার মাঝে হেসে বললো–এখানে দাঁড়িয়ে কি কথাবার্তা হচ্ছে? কি বলছিস তোরা?

বলল নূরী–তোমার নাতনী ফুল্লরার কথা।

ও বড় পাগলী মেয়ে। তা কি হয়েছে?

হবে আবার কি, জাভেদ ওর সঙ্গে রাগ করে কথা বলেছে তাই ওর মন খারাপ।

সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে, এমন কচি বয়স অমন হবেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো–আমার বুড়ো অমনি রাগ করতে একটুতেই।

নাসরিন বললো–দাইমা, তোমার বুড়োর গল্প বলো না একটু

সে কথা তো আবার কি শুনবি। সে অনেক দিন আগের কথা।

বলোই না একটু বললো নূরী।

হেসে বসলো বুড়ি দাইমা একটা পাথর খণ্ডের উপর।

নূরী আর নাসরিনও বসলো সামনের পাথরখণ্ডটার উপর।

দাইমা লাঠিখানা যত্নসহকারে রাখলো একপাশে। তারপর সে বলতে শুরু করলো–আমি যখন দশ বছরের মেয়ে তখন সর্দারের বেটার বয়স ষোল বছর।

বাপু আর সর্দারের খুব মিল ছিল। আমার বাপু আর সর্দারের মধ্যে কথা হলো তারা আমাদের বিয়ে দিয়ে নিজেরা আরও বন্ধুত্ব গভীর করে নেবে। আমার আর সর্দারের বেটার মধ্যে মিল হয়ে গেলো তবে ঝগড়াও লেগে থাকতো সব সময়। ও আমাকে সহ্য করতে পারতো না। তারপর যখন বিয়ে হয়ে গেলো তখন আর কিছু রইলো না। সব ঝগড়ার মীমাংসা হয়ে গেলো... পরে আমাকে ছাড়া একদণ্ডও থাকতে পারতো না, বনে কাঠ কাটতে যেতে আমাকে নিয়ে যেতো সঙ্গে। শিকারে যেতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতো, এমনকি নদীতে মাছ ধরতে গেলেও আমাকে ছেড়ে যেতো না। সেই মানুষটা একদিন আমাকে ছেড়ে চলে গেলো বুড়ি দাইমার গলা ধরে আসলো। আঁচলে চোখ মুছে বললো–স্বামী মেয়েমানুষের মাথার মুকুট অতি যত্ন করে স্বামীকে ধরে রাখতে হয়, তার সেবাযত্ন করতে হয়

দাইমা, তুমি স্বামীর সেবাযত্ন করতে?

তেমনি ফোকলা হাসি হেসে বললো দাইমা–সব সময় তার যত্ন করতাম তবু ধরে রাখতে পারলাম না আমাকে ছেড়ে চলে গেলো। এইবার দাইমা উঠে পড়লো এবং ধীরে ধীরে ফিরে চললো।

*

নূর নিজ শয়নকক্ষে অঘোরে ঘুমাচ্ছিলো।

তার কক্ষের পেছন দিকের পাইপ বেয়ে নিঃশব্দে উঠে এলো জাভেদ। জানালার শার্সী খুলে প্রবেশ করলো ভিতরে।

নূর পাশ ফিরে শুলো।

জাভেদ অতি সন্তর্পণে বিছানার পাশ এসে দাঁড়ালো। দ্রুত হস্তে সে একটা বড় রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেললো ঘুমন্ত নূরের মুখ। তারপর একটা রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো হাত দুখানা।

নূর চিৎকার করতে গেলো কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না তার মুখ দিয়ে। হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় নড়তে পারছে না একচুল।

নূর তবু চেষ্টা চালালো নিজকে মুক্ত করে নেবার জন্য। কিন্তু পারলো না, গভীর ঘুমে অচেতন থাকার জন্যই তাকে সহজে বেধে ফেলতে পারলো জাভেদ।

এবার জাভেদ নূরকে সহজেই তুলে নিলো কাঁধে।

যদিও নূরও কম শক্তিশালী ছিলো না কিন্তু নিদ্রার ঘোরে তাকে কাবু করতে কোনো অসুবিধা হলো না জাভেদের! সে নূরকে সচ্ছন্ধে কাঁধে তুলে নিয়ে বেলকুনির পাশে এসে দাঁড়ালো এবং একটা শব্দ করলো সে মুখ দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে নিচে জাভেদের অশ্ব এসে দাঁড়ালো।

নূরকে কাঁধে নিয়ে লাফিয়ে পড়লো জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে।

জাভেদের অশ্ব ভীষণ আকার দেখতে, তার চোখ দুটো অন্ধকারে আগুনের বলের মত জ্বলছে।

জাভেদ নূরকে কাঁধে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে শুরু করলো।

কান্দাই শহরের বুকে প্রতিধ্বনিত হলো এক বিরাট শব্দ।

সমস্ত কান্দাই শহর জাভেদের অশ্ব খুরের শব্দে জেগে উঠলো, আতঙ্কে শিউরে উঠলো সবাই। তবে আবার দস্যু বনহুরের আবির্ভাব ঘটলো!

পরদিন সকালেই হকার হাঁকলো।

সংবাদ–সংবাদ–আবার দস্যু বনহুরের আবির্ভাব। প্রখ্যাত গোয়েন্দা নূরুজ্জামান চৌধুরীর অন্তর্ধান। হু–হুঁ করে বিক্রি হচ্ছে দৈনিক পত্রিকা।

সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ।

সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে, ফিসফিস করছে।

কারও কারও মুখমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো। আবার কারও কারও মুখ প্রসন্ন দেখাচ্ছে। দস্যু বনহুরকে যারা ভালবাসে তারা খুশি হলো কিন্তু প্রকাশ করবার উপায় নেই কারও, কারণ পুলিশমহল দস্যু বনহুরকে কোনোদিনই ভাল নজরে দেখে না।

পুলিশমহল তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে রেখেছেন, কাজেই বনহুর সম্বন্ধে কেউ কোনো কথা বলতে সাহসী হচ্ছে না।

সংবাদপত্রখানা চৌধুরীবাড়িতে পৌঁছতেই বৃদ্ধ সরকার সাহেব হাতে নিয়ে চশমার ফাঁকে দৃষ্টি ফেললেন প্রথম পৃষ্ঠায়। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোলাটে চোখের মনি দুটো স্থির হয়ে গেলো। নূর অন্তর্ধান, মানে নিখোঁজ। দৃষ্টি বুলিয়ে চললেন তিনি সংবাদপত্রের পাতায়। সংবাদ পড়ে তিনি হতবাক হয়ে পড়লেন, কারণ নূর তার শয়নকক্ষ হতে নিখোঁজ কথাটা যখন মনিরার কানে যাবে তখন ব্যাপারটা ভয়াবহ হবে, কান্নায় ভেঙে পড়বে মনিরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু চেপে রাখা যায় না, বলতেই হবে সরকার সাহেব সংবাদপত্রটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

দোতলায় উঠে মনিরার শয়নকক্ষের দরজায় গিয়ে ডাকলেন–মা মনিরা।

মনিরা কিছু করছিলো, সে বেরিয়ে এলো নিজ কক্ষ থেকে, বললো—-সরকার চাচা আমাকে ডাকছেন?

বললেন সরকার সাহেব–হ। এই নাও.... সংবাদপত্রখানা বাড়িয়ে ধরলেন তিনি মনিরার দিকে।

মনিরা একটু অবাক হলো, কারণ সরকার সাহেব নিজে কোনেদিন সংবাদপত্র এভাবে বয়ে আনেন না। বাড়িতে চাকর বাকরের অভাব নেই, তার আসবার প্রয়োজন তেমন করে না। আজ হঠাৎ তিনি কষ্ট করে সিঁড়ি বেয়ে নিজে এসেছেন সংবাদপত্র দিতে, তা ছাড়া মুখমণ্ডল প্রসন্ন নয়। সরকার সাহেব সদা হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি, তার মুখোভাবে পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিচলিত হলো মনিরা। না জানি কি সংবাদ বহন করে এনেছেন সরকার চাচা।

সংবাদপত্রটা মনিরা হাতে নিলো এবং বললো–কি সংবাদ সরকার চাচা?

সরকার সাহেব বললেন–পড়ে দেখো।

মনিরা সংবাদপত্রটা চোখের সামনে মেলে ধরলো। একনজর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই তাকালো সে সরকার সাহেবের মুখের দিকে।

শেষ পর্যন্ত মনির নিজ সন্তানকে হরণ করে বসলো। কথাটা বললেন সরকার সাহেব।

না, এ কখনও হতে পারে না। বললো মনিরা।

সরকার সাহেব বললেন–তা ছাড়া নূর গেলো কোথায়?

সরকার চাচা, আপনি কি মনে করেন সে নুরকে চুরি করে নিয়ে গেছে?

হাঁ। তা ছাড়া নূরকে এভাবে কে সরাবে বলো?

চাচা, আপনি জানেন তাকে আরও একবার তার শয়নকক্ষ থেকে উধাও করা হয়েছিলো?

জানি।

তাহলে এবারও যে সেই নরপশুর দল নূরকে উধাও করেনি তার কি প্রমাণ আছে?

আছে।

বলুন কি তার প্রমাণ।

সংবাদপত্রের শিরোনামায় দেখেছো?

দেখেছি দস্যু বনহুরের আবির্ভাব?

তাতে কি মনে হয় না এ কাজ সেই করেছে?

না।

তবে কি মনে করছো?

আমার বিশ্বাস, যে অশ্বপদশব্দ কান্দাই নগরীর গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেছে সে অশ্বপদশব্দ মনিরের অশ্বের নয়। যদি সেই হতো তাহলে সে একটিবার আমার সঙ্গে দেখা না করে। যেতো না। সরকার চাচা, এ কাজ অন্য কোন ব্যক্তির। জানি না কি উদ্দেশ্যে সে আমার নূরকে উধাও করলো। আপনি পুলিশ অফিসে ফোন করুন।

আচ্ছা আমি তাই করছি।

সরকার সাহেব চলে যান নিচের তলায়।

মনিরার চোখ দুটো ছলছল হয়ে উঠলো। মুখমণ্ডল বিষণ্ন হলো, সে সংবাদপত্র হাতে নিয়ে মরিয়ম বেগমের কক্ষে প্রবেশ করলো।

বৃদ্ধ মরিয়ম বেগম আজকাল অসুস্থ থাকেন সর্বক্ষণ। তিনি কদিন হলো শয্যাশায়ী। বেশ কিছুদিন হলো নিজ সন্তানের কোন খোঁজখবর পান না, তাই তার মন বড় খারাপ। পূর্বে দেহে শক্তি ছিলো, মনে বল ছিলো তখন তিনি কোনো ব্যথাকে মনে আমল দেননি। তা সহ্য করার ক্ষমতা ছিলো অনেক। এখন দেহের শিথিলতার সঙ্গে মনের অবস্থাও অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছে।

আপন মনেই তিনি আল্লাহর নাম করেন আর দোয়া করেন একটিমাত্র সন্তান তার তাকে যেন তিনি হেফাযতে রাখেন।

মায়ের দোয়া আল্লাহতায়ালা কবুল করেন এবং সে কারণে সমস্ত বিপদকে জয় করে নেবার ক্ষমতা ধারণ করেছে বনহুর।

মনিরা কক্ষে প্রবেশ করতেই মরিয়ম বেগম বালিশে হেলান দিয়ে বসে বললেন–কি সংবাদ বৌমা?

মনিরা নীরবে পত্রিকাখানা শাশুড়ির হাতে দিলো।

মরিয়ম বেগম চোখের চশমাটা ভালভাবে নাকের উপর ঠিক করে দিয়ে বললেন কি লিখেছে

পড়ে দেখ।

মরিয়ম বেগম চশমার ভিতর দিয়ে মনিরার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, কারণ মনিরার কণ্ঠস্বর তার কাছে স্বাভাবিক মনে হলো না এবং এসে কারণেই তিনি পুত্রবধুর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একবার দেখে নিয়ে সংবাদপত্রে চোখ রাখলেন। এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেলেন তিনি খবরটা।

সংবাদপত্রের সংবাদ পাঠ করে মরিয়ম বেগম চোখ তুললেন পুত্রবধুর দিকে। এতক্ষণে তিনি অনুধাবন করলেন ব্যাপারটা। চিন্তিত কণ্ঠে বললেন–আবার নূরকে উধাও করা হয়েছে–কিন্তু কে সে?

মনিরা গম্ভীর কণ্ঠে বললো–তোমার গুণধর ছেলে।

এটা কখনও আমি বিশ্বাস করবো না।

তাহলে নূর গেলো কোথায়?

নিশ্চয়ই কোনো শয়তান লোক কথা শেষ না করেই দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মরিয়ম বেগম।

বললো মনিরা–সরকার সাহেবও তাই মনে করছেন।

কিন্তু মনির এ কাজ করবে এটা কেমন কথা হলো। আমি এর কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

সব পাবে মামীমা, সব পাবে। তোমার মনির কতখানি অমানুষ এবার তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করো।

বৌমা!

একটু নীরব থেকে বলে মনিরা–মামীমা, তোমার মন যেমন বলছে, তেমনি বলছে আমার মন। নিশ্চয়ই তোমার ছেলে তাকে উধাও করেনি, করেছে অন্য কেউ।

মরিয়ম বেগম নিশ্চুপ ভাবতে লাগলেন। তিনি যেন সব কথা হারিয়ে ফেলেছেন। একমাত্র সন্তান মনির, তাকে নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই। তারপর বড় আদরের নাতি নূর তাকে নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। এর চেয়ে মৃত্যু তার শ্রেয় ছিলো।

মনিরার চোখ দুটো ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। বড় অভিমানে, বড় দুঃখে স্বামীর বিরুদ্ধে কটু কথা বলে ফেলেছে শাড়ীর সামনে। এখন সে কারণে মনে খুব ব্যথা অনুভব করছে। স্বামী সন্তানের মুখমণ্ডল ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে! দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো সে পুনরায় সংবাদপত্রের পাতায়।

*

সংজ্ঞাহীন নূরকে অশ্বপৃষ্ঠ হতে নামিয়ে কাঁধে তুলে নিলো জাভেদ, তারপর আস্তানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

সোজা সে প্রবেশ করলো বন্দীশালায়।

জাভেদ নূরকে একটা পাথরখণ্ডের উপর শুইয়ে দিলো।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে নূরী।

রহমান তাকে সংবাদটা দিয়েছিলো, বলেছিলো–নূরী, শীগগীর যাও, জাভেদ নূরকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধরে নিয়ে এসেছে। হয়তো সে তাকে হত্যা করতে পারে।

কথাটা শোনার পর দৌড়ে গিয়েছিলো নূরী জাভেদের সন্ধানে। গিয়ে দেখলো নূরকে পাথর শয্যায় শয়ন করিয়ে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

ফিরে তাকাতেই নূরীর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো জাভেদের।

নূরী বললো জাভেদ একি!

জাভেদ কোনো জবাব না দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

বললো নূরী–থামো!

জাভেদ দাঁড়িয়ে পড়লো।

নূরী বললো–জাভেদ, তুমি মোটেই ভাল কাজ করছে না।

জাভেদ বললো–ওকে এবার উপযুক্ত সাজা দেবো।

না।

কেন?

ওর কোনো দোষ নেই, বেচারা

এত দরদ কেন আম্মু? তুমি জানো না ও কত বড় শয়তান। আমার বাপুকে ও বন্দী করে রেখেছে।

এটা তোমার ভুল ধারণা জাভেদ।

কোনো কথা আমি শুনতে চাই না আম্মু। ওকে আমি শায়েস্তা করবোই।

তুমি বেরিয়ে এসো.. জাভেদ বেরিয়ে গেলো।

নূরীও বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো, কারণ বাইরে জাভেদ আসতেই বন্দীশালার দরজা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়।

নূরী বেরিয়ে এলে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

জাভেদ ততক্ষণে চলে গেছে।

নূরীও হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো রহমানের পাশে। বললো–কি করা যায় বলো রহমান ভাই?

রহমান বললো–কোনো চিন্তা নেই নূরী, আমি খেয়াল রাখবো জাভেদ যেন নূরের কোনো ক্ষতিসাধন করতে না পারে।

তুমিই ভরসা। আমার কাছে জাভেদ যেমন তেমনি হলো নূর। জানি না অদৃষ্টে কি আছে। একটু থেমে বললো নূরী–নূরকে তার বাসায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করো রহমান ভাই।

নূর এখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে।

আমি ওর পাশে যেতে চাই রহমান ভাই।

কিন্তু।

জাভেদ এখন ফিরবে না।

রহমানসহ নূরী প্রবেশ করলো বন্দীশালায়।

নূরী যত্নসহকারে নুরের মাথাটা তুলে একটি পুটলি গুঁজে দিলো তার মাথার নিচে। বললো নূরী–রহমান ভাই, এক বাটি গরম দুধ নিয়ে এসো।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

একটু পর ফিরে এলো একবাটি দুধ নিয়ে।

নূরী দুধের বাটিটা নিয়ে রাখলো নূরের পাশে। বারবার নূরী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

রহমান বললো–তুমি ওর পাশে থাকো, আমি যাই।

রহমান ভাই, তুমি চলে যাবে?

হাঁ যেতে হবে, যে মালামাল সুড়ঙ্গপথে ধরা পড়েছে তা গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে।

তুমি না গেলেই কি নয়?

নূরের পাশে আমার না থাকাই ভাল, কারণ নূর আমাকে দেখলে চিনতে পারবে।

তাহলে কায়েসকে পাঠিয়ে দাও।

সেও অপেক্ষা করছে আমার জন্য। সেই মালামালসহ ট্রাকগুলো যেখানে আটক রাখা হয়েছে।

তুমি যাও কাজ সেরে ফিরে এসো।

হা আমাকে যেতে হবে, কারণ দুই ট্রাক বোঝাই মাল রয়েছে যে মালের মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। এই মালামাল কার জানো নূরী।

শুনেছি কোনো অসৎ ব্যক্তির।

সে ব্যক্তি কে জানো?

না, তেমন কিছু জানি না।

দেশের যারা রক্ষক, যারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বুলি আওড়ায় সেই সব স্বনামধন্য ব্যক্তিদের একজনের। জানো নুরী, এরা সত্ব্যক্তির মুখোশ পরে জনগণের সর্বনাশ করছে।

নূরী অবাক হয়ে বললো–এসব খবর কান্দাইয়ের প্রেসিডেন্ট জানেন না?

জানেন সবাই কিন্তু

বলো রহমান ভাই, কিন্তু কি?

প্রেসিডেন্ট একা সৎ মহৎ হয়ে কি করবেন তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে। সবাই বোঝেন এবং জানেন কিন্তু তিনি এদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে পারছেন না।

কেন? কেন পারছেন না?

কারণ তোমাকে পরে জানাবো। আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। তুমি নূরের দিকে খেয়াল রাখবে।

আচ্ছা। বললো নূরী।

চলে গেলো রহমান।

নূরী ওর মাথাটা তুলে নিলো হাঁটুর উপর। সংজ্ঞা তখনও ফিরে আসেনি নূরের।

নূরী ওপাশের কলসী থেকে এক গেলাস পানি এনে চোখে–মুখে ছিটিয়ে দিতে লাগলো।

একটু পরে নূরের সংজ্ঞা ফিরে এলো।

সে চোখ মেলে তাকালো।

নূরী বললো–ভয় নেই, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করছি।

নূর তাকালো অবাক চোখে নূরীর মুখের দিকে।

নূরী গরম দুধের গেলাসটা তুলে মুখে ধরলো নূরের–খাও।

নূর বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে ছিলো নূরীর দিকে। সে ভাবছে পূর্বে তাকে কোথাও দেখেছে। কতদিন পূর্বে, কোথায় কিছু মনে পড়ছে না।

নূরী বুঝতে পারলো নূর তাকে দেখে বিস্মিত হয়েছে। তাই সে বললো–খেয়ে নাও, আমি তোমার শুভ কামনা করি।

কে তুমি? বললো নূর।

আমি তোমার হিতাকাঙ্খিনী।

কিন্তু আমাকে এভাবে বন্দী করে আনার কারণ কি?

নূরী নীরব।

জবাব দাও।

নূরী তবু কোনো উত্তর দিলো না।

নূর দুধের গেলাসটা এখনও হাতে নেয়নি, সে যদিও ক্ষুধার্ত ছিলো।

বললো নূর–আমাকে তুমি হত্যা করতে চাও?

না।

তবে ঐ দুধে বিষ মিশিয়ে কেন আমাকে খেতে দিচ্ছো!

বিষ!

হাঁ, ঐ দুধে বিষ মেশানো আছে।

না, এ দুধে কোনো বিষ মেশানো নেই।

আমি বিশ্বাস করি না।

তোমাকে হত্যা করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই।

তবে কেন আমাকে এখানে পাকড়াও করে এনেছ।

আমি জানি না।

যাও বেরিয়ে যাও আরও একবার তোমরা আমাকে

তাহলে কেন তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ। সবই তো আঁচ করেছে। আমি তোমার শত্রু নই।

নূরীর কথাগুলো নূরের হৃদয় স্পর্শ করলো। এবার নূর নূরীর হাত থেকে দুধের গেলাসটা নিয়ে নিঃশব্দে পান করলো, তারপর হাতের পিঠে মুখ মুছে নিয়ে তাকালো সে নূরীর মুখের দিকে।

নূরের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

সে তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো, সত্যি নারীটি তার প্রতি সহানুভূতিশীল বটে। দুধে সে কিছু মেশায়নি। শুষ্ককণ্ঠ পরিতৃপ্ত হলো নূরের।

নূরী বললো–আমি যাচ্ছি, তুমি থাকো, পরে আবার দেখা হবে।

নূর চলে গেলো।

দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেলো।

নূর তাকিয়ে রইলো তার চলে যাওয়া পথের দিকে। ভাবতে লাগলো কেমন করে সে এলো এখানে। কেমন করে তাকে আটক করা হলো। ভাবনার অন্ত নেই তার।

জাভেদ বেরিয়ে গেলো, দূর থেকে লক্ষ্য করলো ফুল্লরা। পথরোধ করে দাঁড়ালো সে।

ফুল্লরাকে দেখে মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো জাভেদের, বললো–সরে যাও ফুল্লরা।

ফুল্লরা হেসে বললো–না, তোমাকে আজ ছাড়বো না। জাভেদ, তুমি কি আমার মনের কথা বোঝা না?

জাভেদ গম্ভীর কণ্ঠে বললো না, আমি কারও মনের কথা বুঝতেই চাই না। তুমি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও।

জাভেদ, তুমি আমাকে আঘাত করো তবু আমি তোমাকে ভালবাসবো।

সরে যাও।

না।

জাভেদ ফুরাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে চলে যায়।

ফুল্লরা লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

জভেদ একবার ফিরে তাকিয়েও দেখখো না। ফুল্লরার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা।

আপনা আপনি এক সময় ফুল্লরা উঠে দাঁড়ালো। জাভেদ ততক্ষণে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে চলে গেছে দূরে, ক্ষীণ অশ্বপদশব্দ ভেসে আসছে কানে।

*

মিঃ নূরের অন্তর্ধানে পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেলো। হঠাৎ মিঃ নূরকে কে বা কারা এভাবে উধাও করলো।

তার কোনো হদিস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে গোয়েন্দা বিভাগ।

ইতিপূর্বে আরও একবার হারিয়ে গিয়েছিলো নূর। হঠাৎ ফিরে এসেছিলো সে আশ্চর্য উপায়ে কিন্তু এমনভাবে আবার সে নিখোঁজ হবে তা কেউ ভাবেনি।

মিঃ হারুন এবং শংকর রাও তাদের দলবল নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কারণ তারা জানেন দস্যু বনহুর কোনোক্রমেই নূরকে এভাবে হরণ করবে না। তবে কে করলো এ কাজ?

গভীর রাত্রির অন্ধকারে যে অশ্বপদশব্দ শোনা গেছে তা স্বয়ং দস্যু বনহুরের নয়, কারণ সে যদি হতো তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও দেখা যেতো।

পুলিশমহল জানে দেশে অন্যায় অনাচার অবিচার চরম আকারে বেড়ে গেছে। আবার সেই দুর্নীতি চলছে, চলছে অন্যায়। এক শ্রেণীর লোক যারা স্বনামধন্য ব্যক্তি তারা শুধু লক্ষ লক্ষ টাকার মালিকই নয়, তারা কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। জনগণের রক্ত শুষে নিয়ে এরা আকাশচুম্বী ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে। দুর্নীতির সম্রাট হয়েও তারা স্থান লাভ করেছে মন্ত্রীমহলে। কান্দাই সরকার এ ব্যাপারে সবই জানেন বোঝেন কিন্তু উপায় নেই কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করার। তাহলে যেন রাজ্য চলবে না।

সেদিন কান্দাই শহরে পথ চলছিলো দুই ব্যক্তি। এরা মাতাল অবস্থায় ছিলো। একজন বললো–ভাই, গেলো…

মানে?

মানে বোঝোনা, গেলো

কোনদিকে গেলো? কি গেলো?

দেশ! দেশটা রসাতলে গেলো।

এ কি সব আবোল–তাবোল বলছিস ভায়া?

হ্যাঁ ঠিক বলছি, দেখছিস না চারদিকে তাকিয়ে দেখ।

এই তো দেখছি

কি দেখতে পাচ্ছিস?

দেখছি শুধু কতগুলো জীবন্ত জঞ্জাল

জঞ্জাল।

হ জঞ্জাল ওরা, মানে আবর্জনা

ঠিক বলেছিস ভায়া, আবর্জনাই বটে। যাদের এ দুনিয়ায় কোনো মূল্য নেই তারা আবর্জনাই বটে…

তুমি দেখছি বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলছো?

তবে কি আমি অবুদ্ধিমান?

খুব বুদ্ধি আছে বাবা তোমার।

দেখ বাবা বলবি না, বলবি ভায়া। আমি কি তোর মায়ের স্বামী?

দেখো একবার তুমি একবার তুই এ সব ডাল–খিচুড়ি কথা আমার মোটেই ভালো লাগে না। একবার যা বলবি সব সময় তাই বলবি।

বেশ তাই বলবো তবে হঠাৎ যদি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন সাবধান করে দিবি।

তুমিও কিন্তু বাবা বলতে পারবে না।

আচ্ছা, আমি ভায়াই বলবো, কেমন হলো তো

হাঁ হলো। ঐ যে দেখছিস

আবার তুই!

তওবা, তুমি! এই যে যাদের আবর্জনা বলছে ওরাই হলো দেশের প্রাণ।

প্রাণ!

হ, জীবন মানে ওদের ছাড়া আমরা কেউ বাঁচতে পারি না। কারণ ওরাই জমি চাষ করে ফসল ফলায়, তাই দিয়ে আমাদের উদর পূর্ণ হয়। নইলে তোমার ঐ নাদুস নুদুস শরীর থাকতো না। শুকিয়ে চুপসে যেতে বেলুনের মত।

তাহলে তুমি আমাকে বেলুন বলছো আর ওরা হাওয়া? মানে বেলুনের মধ্যে যে বাতাস আছে। তাই

ঠিক বলেছো, তাই। আমরা সব বেলুন আর ওরা হাওয়া। ওরাই দেশটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। জমিতে চাষ করে ফসল ফলায়, তাই আমাদের উদরে পূরণ করে বেঁচে থাকি। ওরা ইমারৎ গড়ে তোলে আমরা আরামে বসবাস করি। ওরা রাস্তা তৈরি করে আমরা হাওয়াই গাড়িতে চেপে ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াই সেই রাস্তা দিয়ে। কত সময় গাড়ির চাকায় ওদের পিষে মারি তবু ওরা নীরব, কারণ ওরা আবর্জনা। ওদের রস নিংড়ে নিয়ে ছোবড়া ফেলে দিয়েছি। ওরা এখন খাটতে পারে না, এখন ওরা পঙ্গু ঐ দেখছো লোকটার একখানা হাত নেই।

ওকে তুমি চেনো নাকি?

বা-রে চিনবো না কেন? ও যে আমাদের বড় সাহেবের বাড়ির চাকর ছিলো।

তা ওর হাত কি হলো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো–সে এক কাহিনী। থাক শুনে কাজ নেই।

তবে বললি কেন?

আবার তুই বলা!

না না, তুমি বলবো বাবা।

আবার বাবা, বলো ভায়া।

হাঁ। এই নাক কানে খত দিচ্ছি। আর বলবো না। বলো কি কাহিনী?

তোমাকে বলবো কিন্তু তুমি তো কাউকে বলবে না?

না, না, আমি কাউকে বলবো না, বলো?

বড় সাহেব মস্ত বড়লোক, তিনি সরকারের লোক। এদের কথা বাহিরে প্রকাশ করা উচিৎ নয় তবু বলছি কিন্তু সাবধান কাউকে বলবে না।

না বলবো না, তুমি বলো?

কিছু মাল এসেছিলো গোপনে–চিনির বস্তা! বাড়ির বড় গেটে পুলিশ পাহারা থাকে বন্দুক নিয়ে। কেউ যেন বড় সাহেবকে অহেতুক বিরক্ত করতে না পারে। এটাই নিয়ম। সরকারের লোক যারা হন তাদের বাড়ির ফটকে ছোট্ট কুঠরী হয়, তার মধ্যে সজাগ ভাবে বসে থাকে পুলিশপ্রহরী।

ভূমিকা রেখে সোজা কথায় বলো?

বাড়ির সামনে দিয়ে তো কিছু আনতে গেলে বা নিতে গেলে লোকচক্ষুতে ধরা পড়ে যাবে, তাই বড় সাহেবদের বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে কিছু মালামাল যাওয়া–আসা করে।

তাই নাকি বন্ধু? তা তো জানতাম না।

জানবে, জানবে সব জানবে। কতদিন চলবে এই লুকোচুরি খেলা।

দেখো ভায়া, তুমি কিন্তু আবার সরে যাচ্ছো আসল কথা থেকে।

না না, সরে গেলেও ফিরে আসতে কতক্ষণ। পেছন দরজা দিয়েই কয়েক বস্তা চিনি ভেতর বাড়িতে পার করে দেওয়া হচ্ছিলো। সরকারের লোক, শুধু ফোন করে বলা, তাহলেই কত মহাজন মালামাল নিয়ে হাজির হন তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

আবার সরে যাচ্ছো আসল কথা থেকে।

মোটেই সরে যাইনি। সব মনে আছে ভায়া, এসব কথা কি ভুলবার! শোন, কয়েক বস্তা চিনি এসে গেলো। ঐ বস্তাগুলো পার করতে গিয়ে প্রাচীরের উপর থেকে বেচারা পড়ে গেলো নিচে। নিচে পাথর আর ইট ছিলো, বেচারা এমন ভাবে আঘাত পেলো ডান হাতখানার হাড় গুড়ো হয়ে গেলো। তারপর বুঝতেই পারছ

না ভায়া, আরও খোলসা করে বলো?

তবে সব না শুনে ছাড়বে না?

না

তবে চলো বসি গিয়ে ঐ লাইটপোষ্টটার নিচে।

কিন্তু লাইটপোস্টটা যদি সব শুনে ফেলে?

আরে যা, লাইটপোষ্টের আবার কান আছে নাকি?

আছে ভায়া আছে, দেয়ালেরও কান আছে। বড় সাহেবদের কথা বলতে নেই।

কেন? কেন? কেন বলতে নেই?

আরে তাঁরা হলেন আমাদের নেতা–দেশের–দশের হিতাকাক্ষী, জনগণের বন্ধু মানে জনদরদী বন্ধু। তাদের কথা কি বলা যায়। তা ছাড়া কথাটা যদি প্রকাশ পায় তাহলে অতি কষ্টের চাকরিটাও যাবে। কালকেই ঐ ওর মত আমার অবস্থা হবে। জানো তো চাকরিটা পেতে আমাকে কত কাঠ–খড় পোড়াতে হয়েছে।

আমার কথা তুমি জানো না বন্ধু, আমার দুবিঘা জমি বেঁচতে হয়েছিলো তিন শটাকা মাইনের চাকরিটার জন্য।

আমার বসত বাড়ির ভিটাটুকু বিক্রি করে তবে এই সাড়ে চার শটাকা মাইনের চাকরি। কত সাধনার ধন এই চাকরি আমার।

তোমার বসত বাড়ির ভিটাটুকু বিক্রি করেছো?

হা ভায়া।

ভালো কাজ করোনি। শুনেছিলাম ঐ বাড়িটুকুই তোমাদের সম্বল।

হাঁ, ভায়া, সে কথা সত্যি। বসতবাড়ির ভিটাটুকু বিক্রি করার পর বুড়ো বাপ–মা পথের ভিখারী হয়েছে। ভেবেছিলাম চাকরি পেলে বাবা–মাকে নিয়ে আসবো শহরে আমার বাসায়, এনেও ছিলাম কিন্তু.....

কিন্তু কি?

বৌ, আমার বৌ আমার বাবা–মাকে দুচোখে দেখতে পারে না—-

তাই বুঝি বাপ-মাকে

হাঁ। দিনরাত বৌয়ের মুখ ভার আর ঝগড়াঝাটি, অসহ্য একেবারে অসহ্য, তাই…

তাই বুড়ো বাপ–মাকে পথের ভিখারী করেছে ভায়া?

কি করবো বলো, আমি যে উপায়হীন।

যারা তোমার জন্মদাতা, যাদের স্নেহ–মায়া মমতায় তুমি এত বড় হয়েছে, আর কি না। তাদেরকেই তুমি পথের ভিখারী করেছে।

শুধু কি তাই, ঐ বাপ–মার মাথা গুজবার ঠাইটুকুও তারা দিয়েছিলো সন্তানের সুখ–সাচ্ছন্দ্যের জন্য আর কিনা আজ… বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো ওর কণ্ঠস্বর।

বললো অপর জন–ঐ টাকা তুমি কাকে দিয়েছিলে ভায়া?

দিয়েছিলাম চাকরি দেবার যাদের ক্ষমতা আছে তাদেরকে।

তবে কি বলতে চাও তোমাদের বড় সাহেব ঐ টাকা নিয়েছেন?

নিয়েছেন তার পারিষদগণ। শেয়ার, শেয়ার পেয়েছেন তিন ভাগের দুভাগ আর বাকি একভাগ তার পারিষদগণ মানে নিম্ন পদের কর্মকর্তাগণ।

আরে ভায়া, শুধু কি চাকরি বাকরি, যে কাজে যাবে সেই কাজেই চাই মালপানি–মালপানি ছাড়া একটা কাজও হাসিল হবে না।

শুধু দুর্নীতি আর অন্যায় অনাচার। বড় সাহেব থেকে ছোট চুনোপুটি আমাদের মত সাহেবরাও কেউ কমে ছাড়ি না।

তা ঠিক, শুধু দেশের প্রেসিডেন্ট সৎ–মহৎ হয়ে কি করবেন। আমরা সবাই চোর–কেউ ছোট চোর, কেউ বড় চোর। যেমন আমাদের বড় সাহেব কয়েক বস্তা চিনি চুরি করতে গিয়ে…

ধরা পড়ে গেলেন বুঝি?

কি যে বলো, ধরা পড়বে বড় সাহেবরা? কক্ষনো না, ধর পাকড় যত চুনোপুটিদের। তাইতো ভয় হয় সব কথা বলতে। যেমন দেয়ালের কান আছে

তেমনি পথেরও কান আছে, ঐ লাইটপোস্টটারও কান আছে, বুঝলে? কোনো কথা বলা উচিত নয়

যাক তুমি এবার আসল কথায় এসো দেখি।

কোনটা আবার নকল কথা দেখলে, সবই তো আসল কথা।

ঐ যে পঙ্গু লোকটার কথা।

ও হাঁ, চিনির বস্তা পেছন প্রাচীর টপকে পারাপার করে নিতে গিয়ে বেচারা বা হাতখানা গেলো গুড়িয়ে, তারপর হসপিটালে পাঠানো হলো। বড় সাহেব টেলিফোন করে হসপিটালে বলে দিলেন। প্রাচীরের গায়ে ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে পড়ে ওর এই অবস্থা হয়েছে। একটু থেমে বললো সে–বড় সাহেবের কথায় ভর্তিটা সহজেই হয়ে গেলো হসপিটালে কিন্তু যখন বেরিয়ে এলো হসৃপিটাল থেকে তখন ওর ডান হাতখানা আর দেহের সঙ্গে সংযুক্ত নেই

সংযুক্ত নেই?

না।

গেলো কোথায়?

উড়ে গেলো একখানা হাত।

হাঁ, উড়ে গেলো মানে হাতখানা এমনভাবে গুঁড়িয়ে গিয়েছিলো যে, অপারেশন করে দেহ। থেকে কেটে ফেলতে হলো।

তারপর?

তারপর যখন ফিরে এলো তখন বড় সাহেব করুণ কণ্ঠে কিছু আফসোস করলেন, তারপর একশ টাকার দুখানা নোট ওর হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মানে?

মানে ওকে বিদায় করলেন।

যে বড় সাহেবের অসৎ কর্মের জন্য তার হাত গেলো আর সেই সাহেব কিনা দুশ টাকা দিয়ে তাকে বিয়ে করলেন?

তা ছাড়া কি করবেন, ওর কি আর কাজ করবার ক্ষমতা আছে? ডান হাতখানা হারিয়ে গেছে, সে কোনো কাজই আর করতে পারবে না মানে এক হাতে কি কোনো কাজ হয়, তাই

তাই বিদেয় করলেন?

হাঁ, ঐ যে এখন সে ভিক্ষে করে। আহা বেচারার কি মোটা–সোটা শরীরটাই না ছিলো। শোন, খবরদার এ কথা মানে বড় সাহেবদের কথা যেন বাইরে কেউ জানতে না পারে। তাহলে আমার অবস্থাও কিন্তু ঐ ওর মতই হবে।

তাই বলে নীরবে সব সহ্য করবো আমরা?

এ ছাড়া উপায় কি বলে? কত চেষ্টার চাকরীটা হারাবে? যে চাকরির জন্য নিজেরা পথে বসেছি, যে চাকরির জন্য বাপ মাকে পথের ভিখারী বানিয়েছি সেই চাকরি নষ্ট করবো? কক্ষণো না। বড় সাহেবরা যদি অসৎ উপায়ে ধনসম্পদ বাড়াতে পারেন আমরা কেন পারবো না? বড় সাহেবরা যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কালোবাজারি করেন আমরা ছোট সাহেব হাজার হাজার না পারি শত শত টাকার কালোবাজারি তো করতে পারবো।

ঠিক বলছো ভায়া, বড় সাহেবরা মানে আমাদের নেতারা যদি সাধুতার মুখোস পড়ে গাড়ি বাড়ির ঐশ্বর্যের ইমারৎ গড়ে তোলে আমরা কেন পারবো না? আমরাও পারবো, গাড়ি–বাড়ি ঐশ্বর্যের ইমারৎ গড়তে না পারি, সামান্য খেয়ে–পরে যেন বাঁচতে পারি, তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। মা–বাবা যেন পথের ভিখারী না হয়। ছেলেমেয়ে যেন একটু লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারে। বৌকে লক্ষ টাকার অলংকার দিতে না পারলেও মোটাকাপড় মোটা ভাত দিতে হবে, এটুকু না পারলে আমাদের বেঁচে থেকে কি লাভ হবে?

তা তো বুঝলাম কিন্তু…

কোনো কিন্তু নেই, চলো এবার ফেরা যাক।

কিন্তু

বলে ফেল, শুধু কিন্তু আর কিন্তু করো না।

বড় সাহেবদের বড় বড় ভূড়ি, তারা সব হজম করতে পারে, আমাদের এসব অসৎ উপায়ে উপার্জিত ধনসম্পদ হজম হবে তো?

আরে ছোঃ কি যে বলো! আজকাল যেদিকে তাকাবে দেখবে সবাই কালোবাজারি করছে। গোটা কান্দাই দেশটা কালোবাজারিতে ভরে গেছে। চুনোপুটি থেকে রাঘব বোয়াল পর্যন্ত হা করে আছে, বুঝলে ভায়া?

তাতো বুঝলাম কিন্তু

কোনো কিন্তু নেই, যা পাবো পকেটে পুরবো। মসলা ছাড়া একটা কথাও আমরা বলবো না।

কিন্তু এর পরিণাম কি জানো–অকস্মাৎ একটা কণ্ঠ ভেসে এলো ওদের কানে। চমকে উঠলো ওরা। ফিরে তাকিয়ে দেখলো অদূরে লাইটপোষ্টটা কথা বলছে।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো ওদের মুখ।

তাদের দুচোখ ছানাবড়া হলো, কারণ লাইটপোষ্টটা এমন কথা বলতে পারবে ভাবতে পারেনি ওরা। ভয়ে ভয়ে চোখ তুললো আবার।

লাইটপোষ্টটা কেমন যেন বিদঘুটে হাসি হেসে কর্কশ কণ্ঠে কথা বলছে। এতক্ষণ ওরা বেশ নিশ্চিন্তভাবে কথা বলছিলো। সত্যি সত্যি যে লাইটপোষ্টটার কান আছে ওরা জানতো না।

তাই মন খুলে কথা বলছিলো ওরা দুবন্ধু মিলে।

এখন লাইটপোষ্টটাকে কথা বলতে দেখে অবাক হলো ওরা, ঢোক গিলে বললো–তুমি আমাদের সব কথা শুনে ফেলেছো?

বললো লাইটপোষ্ট–হাঁ, সব কথাই আমি শুনে ফেলেছি। শুধু তোমাদের কথা নয়, তোমাদের মত আরও অনেকের কথা।

বললো প্রথম ব্যক্তি–আমি জানতাম তোমাদের কান আছে কিন্তু জানতাম না তোমরা কথা বলতে পারো।

বললো লাইটপোষ্ট–শুধু আমি কেন, আমার সব ভাইরা কথা বলতে পারে– যেমন, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, প্লেন, ষ্টিমার, জাহাজ, পথঘাট, মাঠ–গাছপালা, দেয়াল, মেঝে, নদীনালা, আমার সহোদর ভাইবোন লাইটপোষ্টগুলো, এমন কি হাওয়াও কথা বলতে পারে, শুনতেও পারে।

তাই নাকি?

শুধু শুনতে আর বলতেই পারি না, চোখেও দেখি আমরা। তোমরা যত বড়ই হওনা কেন–রাজা–মহারাজা, নেতা আর মহানেতা আর চুনোপুটি যে যা করো আর বলল সব আমরা দেখি আর শুনি। যখন তোমাদের সময় থাকে তখন তোমরা মজা লুটে নাও, যখন সীমা ছাড়িয়ে যাও তখন আমরা সবাই মিলে তোমাদের রস নিঙড়ে বের করে নেই।

সে কেমন? বললো দ্বিতীয় ব্যক্তি।

লাইটপোষ্টটা তেমনি কর্কশ কণ্ঠে বললো–সে কথা আজ নাই বা শুনলে। যখন সময় আসবে। তখন সবই আঁচ করে নেবে। জানো না পেটে খেলে পিঠে সয়।

তোমার কথাগুলো সব হেয়ালিপূর্ণ লাইটপোষ্ট ভায়া। একটু বুঝিয়ে বলল না? বললো প্রথম ব্যক্তি।

লাইটপোষ্ট বললো– আমাদের চেয়ে তোমরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান তবু তোমরা বড় বোকা।

কেমন করে বোকা হলাম? বললো দ্বিতীয় ব্যক্তি।

জানো না তোমাদের পূর্বপুরুষদের কথা যারা সৎ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন আর যারা অসৎ কালোবাজারী দুর্নীতিবাজ ছিলেন তাদের পরিণতি কি হয়েছে তাও তোমরা জানো। যেমন করে তারা কলাকৌশলে জনগণের রস নিঙড়ে শুষে নিয়েছে, তেমনি করে সেই মহান নেতাদের রস শুষে নেওয়া হবে, বুঝলে ভায়া? যাও এখন লক্ষ্মী ছেলের মত বাড়ি ফিরে যাও…

প্রথম ব্যক্তি বললো–তুমি তো আমাদের কথাগুলো বড় সাহেবকে বলবে না?

আরে না না, বলবো না। তোমরা তো চুনোপুটি আর তারা রাঘব বোয়াল।

তাই তো এত ভয় কখন যে আমাদেরকে গ্রাস করবেন তার ঠিক নেই। বললো দ্বিতীয় ব্যক্তি।

লাইটপোষ্ট বললো–আরে বোকা, তোমাদের গ্রাস করা কি তারা বাকি রেখেছেন? তোমাদের রক্ত শুষে নিয়ে শুধু ছোবড়াটা রেখেছেন আবর্জনার মত। ডাষ্টবীনেও ফেলতে পারেন না, আবার তাদের ইমারতেও স্থান দিতে পারেন না। ছোবড়াগুলো দিয়ে কোনো রকমে কাজ হাসিল করে নিচ্ছেন স্বনামধন্য ব্যক্তিরা।

এতই যখন বললে ভায়া তখন আর একটু বলো। বললো প্রথম ব্যক্তি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো–লাইটপোষ্ট ভায়া, তোমার কথাগুলো কিন্তু বড় সুন্দর লাগছে আর একটু বলবে?

তোমরা যদি ধৈর্য ধরে শোন তবে বলতে আমার আপত্তি নেই। আমি তোমাদের মঙ্গল চাই।

তা তো তোমার কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পারছি। বলো না কিভাবে চললে আমরা বাঁচতে

বললো লাইটপোষ্ট–বাঁচতে যদি চাও তবে অন্যায়কে পরিহার করে। তোমরা যেটাকে মন্দ কাজ বলে মনে করবে তা কোনো সময় করবে না।

আমরা না হয় সৎপথে চলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু বড় সাহেবরা যারা নেতৃস্থানীয় তারা যদি

তারা রেহাই পাবে না। যেমন করে জনগণের রক্ত শুষে নিয়ে তারা ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়েছে, তেমনি জনগণই তাদের রক্ত শুষে নেবে। চিরদিন কেউ সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকতে পারে না। একদিন তাকে নেমে আসতেই হবে পথের ধূলোয় যেমন তোমাদের পূর্বপুরুষদের নেমে আসতে হয়েছিলো

হঠাৎ মোটরের হর্ন বেজে উঠলো, চমক ভাঙলো পথিকদ্বয়ের, নেশাও কমে এসেছে।

ততক্ষণে লাইটপোষ্ট নীরব হয়ে গেছে।

পথিকদ্বয় চলতে শুরু করলো।

গাড়িখানা এসে থেমে পড়লো ঠিক লোকদুটির পাশে।

একজন পুলিশের পোশাকপরা লোক নেমে এসে ওদের লক্ষ্য করে বললো– গাড়িতে উঠে।

পিলে চমকে গেলো ওদের।

পুলিশ কেনরে বাবা।

ওরা বাধ্য হলো গাড়িতে উঠতে।

তারপর যখন পুলিশ অফিসে নেওয়া হলো তখন তাদের মদের নেশা কেটে গেছে। অবাক হলো, ব্যাপার কি পুলিশরা তাদের দুজনকে পাকড়াও করে আনলো কেন?

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলো–সারারাত তোমরা কোথায় ছিলে?

স্যার রাস্তায়।

কেন? কেন রাস্তায় ছিলে?

হাওয়া খাচ্ছিলাম।

তোমরা হাওয়া খাচ্ছিলে আর তোমাদের বাড়ি থেকে ডায়রী করা হয়েছে তোমরা হাইজ্যাক হয়েছে। খবরদার, আর যেন এমন কাজ করো না।

অপর একজন পুলিশ অফিসার বললো–প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নূরুজ্জামান চৌধুরীর উধাও ব্যাপার নিয়ে আমরা হিমসিম খাচ্ছি, আবার তোমাদের খুঁজে বেড়াবো আমরা। যাও বাড়ি চলে যাও, খবরদার, আর রাতে ঘুরে বেড়াবে না।

প্রথম পুলিশ অফিসার বললেন–একবার যদি দস্যু বনহুরের কবলে পড়ে তাহলে নিস্তার পাবে না।

স্যার, আপনি বেয়াদবি নেবেন না, আপনাদের কবলে পড়লেই নিস্তার থাকে না, দস্যু বনহুর তো আমাদের বন্ধুলোক। তাকে খুঁজে খুঁজেই তো আমরা হয়রান হচ্ছি। সে যদি থাকতো তাহলে কান্দাই শহরে এমন

বলো, থামলে কেন?

বললে অপরাধ হতে পারে। তাছাড়া চাকরিটা যদি চলে যায় তাহলে বৌ–বাচ্চা নিয়ে মারা পড়বো।

কথা দিলাম চাকরি যাবে না।

সত্যি বলছেন তো?

হা বলো?

দেশ দুর্নীতিতে ভরে গেছে স্যার। যদি দস্যু বনহুর কান্দাই থাকতো তাহলে এত দুর্নীতি বেড়ে যেতে পারতো না

তোমরা দেখছি দস্যু বনহুরের ভক্ত?

স্যার, সে দস্যু হতে পারে কিন্তু দুর্নীতিবাজ নয়।

তবু সে অপরাধী। তাকে পেলে আমরা এরেষ্ট করবে। শুধু তাই নয়, নূরুজ্জামান চৌধুরীকে উধাও করার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে।

বললো পথিকদ্বয়ের একজন–আমরা জানি সে কান্দাই শহরে নেই।

তোমরা তাহলে জানো। এক্ষুণি এরেষ্ট করে। পুলিশ অফিসার পথিকদ্বয়কে এরেষ্ট করার নির্দেশ দিলেন।

পুলিশ এগিয়ে এলো ওদের হাতে হাত কড়া লাগানোর জন্য।

দ্বিতীয় পথিক বললো–স্যার, আমাদের দুজনকে এরেষ্ট করে কোনো ফল হবে না। দস্যু বনহুরের ভক্ত কান্দাই শহরের সবাই। দস্যু বনহুর যদি কান্দাইয়ে অবস্থান করতো তাহলে এমন অন্যায় অনাচার চলতো না। যা সত্য তাই আমরা বলেছি।

প্রথম পথিক বললো–স্যার, আমাদের দুজনকে বন্দী করে সবার মুখ বন্ধ করতে পারবেন না। ছেড়ে দিন স্যার, তবু আপনাদের কথা রক্ষা হবে। কারণ আপনারাই বলেছেন নিউঁকিভাবে যে সত্য কথা বলে তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। মনে এক মুখে এক তেমন লোক আমরা নই–যা মনে তাই মুখে বলি সার। আমরা সত্যবাদী

পুলিশ অফিসার বললেন–দাও, ওদের হাতকড়া খুলে দাও। চলে যাক, ওদের বৌ-বাচ্চারা পথ চেয়ে বসে আছে।

পুলিশ তার স্যারের কথায় ওদের হাতকড়া খুলে দিলো।

ওরা বেরিয়ে যেতেই বললো পুলিশ অফিসার–দেশবাসীর মুখ ধরে রাখা যায় না। যা সত্য বলবেই। আজ কান্দাই শহর দুর্নীতি আর অনাচারে ভরে উঠেছে। যারা নেতৃবৃন্দ তারাই রক্ষক হয়ে ভক্ষক হয়েছে। বিচার বলে কিছু নেই....

স্যার, আপনি এ কথা বলছেন?

না বলে উপায় নেই, কারণ আমরাও তো মানুষ। আমাদেরও তো মন বা হৃদয় বলে কিছু একটা আছে। সব বুঝি, সব বুঝেও আমরা বোবা বনে বসে আষি। আমাদের কর্মকর্তাগণ যদি দুর্নীতি করেন তাহলে আমরা আর কি করবো আমরা তো চুনোপুটি।

স্যার!

জানি আমরাও অন্যায় করছি–কত অপরাধী অর্থের বিনিময়ে নির্বিঘ্নে খালাস হয়ে গেছে আর কত নিরপরাধী নানা দুর্ভোগ নির্যাতনে জর্জরিত হয়েছে।

স্যার আপনাদের মত রাঘব বোয়াল এসবের হোত। আপনারা যদি সৎ–মহৎ হন তাহলে আমরাও আপনাদের পথ অনুসরণ করবো।

*

হসপিটালের রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলো আশা ধূসর আকাশটার দিকে। নিচে লন্ডন নগরী। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আলোকগুলো নিভে গেছে তবু

দুএকটা বাড়ির দোতলায় কিংবা গাড়ি–বারান্দায় বিজলী বাতির বাগুলো মিট মিট করে জ্বলছে।

দিনের আলোতে বিজলী বাতির তেজোদ্দীপ্ত আলোর ঝিলিক মান হয়ে গেছে, অসহায় চোখে যেন তাকিয়ে আছে ওরা মৃত্যুকরুণ চোখে।

কাঁধে হাত রাখলো কেউ।

চমকে ফিরে তাকালো আশা। চিনতে বাকি রইলো না বনহুর তার পাশে দাঁড়িয়ে।

চাপাকণ্ঠে বললো বনহুর–আশা, আমার কাজ প্রায় সমাধা হয়ে এসেছে, এবার ফিরে যাবার পালা। তুমি প্রস্তুত থেকো। কথাটা শেষ করেই সরে গেলো বনহুর।

আশা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো।

নিকটে কোনো বাংলো থেকে ভেসে আসছে পিয়ানোর আওয়াজ।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আশা, লণ্ডন নগরীটাকে তার কাছে অপূর্ব মনে হচ্ছে। এতদিন দৃষ্টিশক্তি ছিলো না, সে এমন করে লন্ডন নগরী দেখতে পায়নি। আকাশ বাতাস আজ সব তার কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে। সবচেয়ে আজ তার খুশির দিন। বনহুরকে সে পুনর্বার দেবার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

আশার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল লাগছে আজ। তার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। ফিরে যাবে বনহুরের সঙ্গে সে নিজ দেশে।

কিছুক্ষণ পূর্বে মিঃ আরমানের বেশে তার প্রিয় দস্যু বনহুর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে গেলো, আশা আমার কাজ প্রায় সমাধা হয়ে এসেছে, এবার ফিরে যাবার পালা। তুমি প্রস্তুত থেকে। সেই শান্ত গম্ভীর পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠস্বর।

আশার চোখ দুটোতে অপূর্ব এক আনন্দ উচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছে। জীবনে সে একটা পুরুষকেই। ভালবেসেছিলো–সে ঐ দস্যু বনহুর। যার মধ্যে সে দেখতে পেয়েছিলো এক দীপ্তমান পুরুষকে, যার সঙ্গে তুলনা হয় না এ কালের কোনো পুরুষের। কিন্তু...

কি ভাবছো বোন আশা? পাশে এসে দাঁড়ালো মিস রীমা।

আশার মুখে একটা আনন্দদীপ্ত হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললো–আশা– ভাবছি এবার ফিরে যাবার পালা।

কে বলেছে, তোমার বন্ধু আরমান?

হা। ঐ বলেছে।

আশা আর রীমার মধ্যে যখন কথাবার্তা হতো তখন সব কথা ওরা উভয়ে উভয়কে বলতো। কারণ আশা জানে মিস রীমার কাছে তার লুকোবার কিছু নেই। তাই ওরা দুজন মন খুলে কথা বলতো।

মিস রীমা বললো–আশা আপু, তুমি বলেছিলে একদিন তোমার জীবন কাহিনী বলবে? তারপর তুমি কিন্তু কথাটা চেপে গেছে।

আমার জীবন কাহিনী সে এক বিস্ময়।

বিস্ময় বলেই তো জানবার এত সাধ।

শুনলে তুমি দুঃখও পাবে।

তবু একটু বল?

আমার জীবন তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটা শিশুকাল, একটা মধ্যম কাল, একটা শেষ কাল

হেসে বললো মিস রীমা–শেষ কাল তো এখনো আসেনি, তাই মধ্যম কাল বলে।

না, আমার জীবনের শেষ কাল মানে শেষ অংশ নিয়ে বলবো। শিশুকাল বড় কষ্টের ছিলো, যখন দেড় বছর আমার বয়স তখন হারিয়ে যাই মানে চুরি করে নিয়ে যায় কোনো এক দুষ্কৃতিকারীদল। মধ্যম কাল বড় যাতনার। এক জলদস্যুর কবলে পড়ি, তারপর কৌশলে উদ্ধার পাই। লাভ করি সাত রাজার ধন বিপুল ধনসম্পদ। জানি ফিরে গেলেও আর সভ্য সমাজে আশ্রয় পাবো না, তাই ফিরে যেতে চাইলেও অবচেতন মন মানা করেছে, তাই যাইনি।

তারপর?

তারপর আমি হলাম বিপুল ধনভাণ্ডারের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। ইচ্ছামত বিচরণ করে ফিরতাম, ইচ্ছামত যা খুশি করতাম, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে নদী নালা সমুদ্রে সর্বত্র ছিলো আমার বিচরণ। কেউ আমাকে আয়ত্তে আনতে পারলো না। কোনোদিন কোনো পুরুষ আমার ছায়া স্পর্শে সাহসী.হতো না। বহুবার আটক করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কেউ আমাকে আটক করতে পারেনি কোনদিন।

বিস্ময়ভরা চোখে মিস রীমা তাকিয়ে ছিলো আশার মুখের দিকে, সে কিছুতেই আশার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিলো না যেন। আশার সুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে মিস রীমা ভাবছে অনেক কিছু। মন তার চলে গেছে দূরে। বললো সে–আশা আপু, তোমার কথাগুলো যেন কল্পনার জাল।

না সোমা, কল্পনার মায়াজাল নয়, সব সত্যি। একদিন আমি একটা বাঘ শিকার করি কিন্তু সেই মুহূর্তে আরও একটা তীর এসে গেঁথে যায় বাঘটার দেহে। আমি এগিয়ে যেতেই দূর থেকে নজরে পড়ে এক বলিষ্ঠ পুরুষ তার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো। আমি সরে দাঁড়ালাম আমার অশ্ব নিয়ে। আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম, বাঘ শিকারের কথা আমি ভুলে গেলাম সেই মুহূর্তে। দৃষ্টি আমার সেই তেজোদ্দীপ্ত বলিষ্ঠ পুরুষটার দিকে।

তারপর?

আমি যখন অবাক হয়ে তাকে লক্ষ্য করছি তখন সে বাঘকে লক্ষ্য করছে। বাঘটার দেহে আরও একটা তীর বিদ্ধ দেখে সে অবাক হয়েছে বুঝতে পারলাম। সে তাকাচ্ছে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। আমার বড় আনন্দ লাগছে। ওর দৃষ্টি এড়িয়ে আমি ফিরে এলাম আমার আস্তানায়। কিন্তু সর্বক্ষণ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলো সেই বলিষ্ঠ পুরুষটা। যতই মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু আরও বেশি করে দাগ কেটে বসে যেতে লাগলো। ভাবলাম, জীবনে কোনো পুরুষ আমার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি অথচ আমি এবার হেরে গেলাম। ভেবেছিলাম আমি জয়ী হবে কিন্তু পারলাম না, পরাজিত হলাম।

তারপর?

ওর সন্ধানে আবার সেই জঙ্গলে গেলাম। সন্ধান করে ফিরতে লাগলাম ওকে। হাঁ, দেখা পেলাম…

বলো থামলে কেন?

দূর থেকেই ওকে দেখতাম অতৃপ্ত নয়নে শুধু দেখতাম, তারপর ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগলাম। সে শুধু বলিষ্ঠ দীপ্ত পুরুষই নয়–সে এক বিস্ময়কর পুরুষ। লোভ মোহ লালসাহীন মানুষ– আমি জানি এ পৃথিবীতে এ যুগে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার নেই লোভ লালসা মোহ। সত্যি আমি ওকে নিজের অজ্ঞাতে ভালবেসে ফেললাম।

আমি জানি কে সে।

রীমা, তুমি অত্যন্ত চালাক মেয়ে, কাজেই তুমি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে কে সে। কিন্তু আমি ভুল করেছি যার কোনো সমাধান নেই।

তুমি ভুল করোনি আশা আপু, সত্যিই সে এক মহাপুরুষ। তাকে ভালবেসে তুমি জয়ী হয়েছে।

জানি না আমি জয়ী না পরাজিত। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলো আশা অতি সংগোপনে।

মিস রীমা বললো–আশা আপু, আমি বলবো তুমি ভাগ্যবতী নারী।

কিন্তু আমি জানি কতখানি ভাগ্যহীনা নারী আমি। আমি ওকে ভালবাসি কিন্তু ওর ভালবাসা। আমি পাইনি কোনোদিন, বড় নিষ্ঠুর ও।

আশা আপু, তুমি তাকে এতকাল ভালবেসে এসেছে কিন্তু তাকে চিনতে তুমি ভুল করেছে। তোমার ভালবাসা তাকেও আকৃষ্ট করেছে তুমি তা জানো না আর জানো না বলেই তুমি অভিমান করছে।

রীমা, জানি না কেন মাঝে মাঝে মনটা হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় কিছুই পেলা জীবনে। ব্যর্থ এ জীবন। নারীর সুখ স্বামী–সন্তান–পরিজনদের নিয়ে আর আমি!

না না, তুমি ব্যর্থ হওনি। দস্যু বনহুরকে তুমি ভালবাসতে পেরেছে, তার সান্নিধ্য লাভ করেছে–এটাই তোমার জীবনে চরম পাওয়া।

হাঁ, সে আমাকে পবিত্রতার ছোঁয়ায় আরও পবিত্র করেছে, এ কথা মিথ্যা নয়।

আশার কথা শেষ হয় না, পেছনে ঠাণ্ডা একটা শক্ত কোনো বস্তুর স্পর্শ অনুভব করে সে।

চমকে ফিরে তাকাতেই নজরে পড়লো দুজন পুলিশ অফিসার আশার পেছনে রিভলভার চেপে ধরেছেন।

মিস রীমার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

[পরবর্তী বই মঙ্গল গ্রহে]

পূর্ববর্তী:

« ৭.০৫ বনহুর ও হাঙ্গেরী কারাগার

পরবর্তী:

৭.০৮ মঙ্গল গ্রহে »